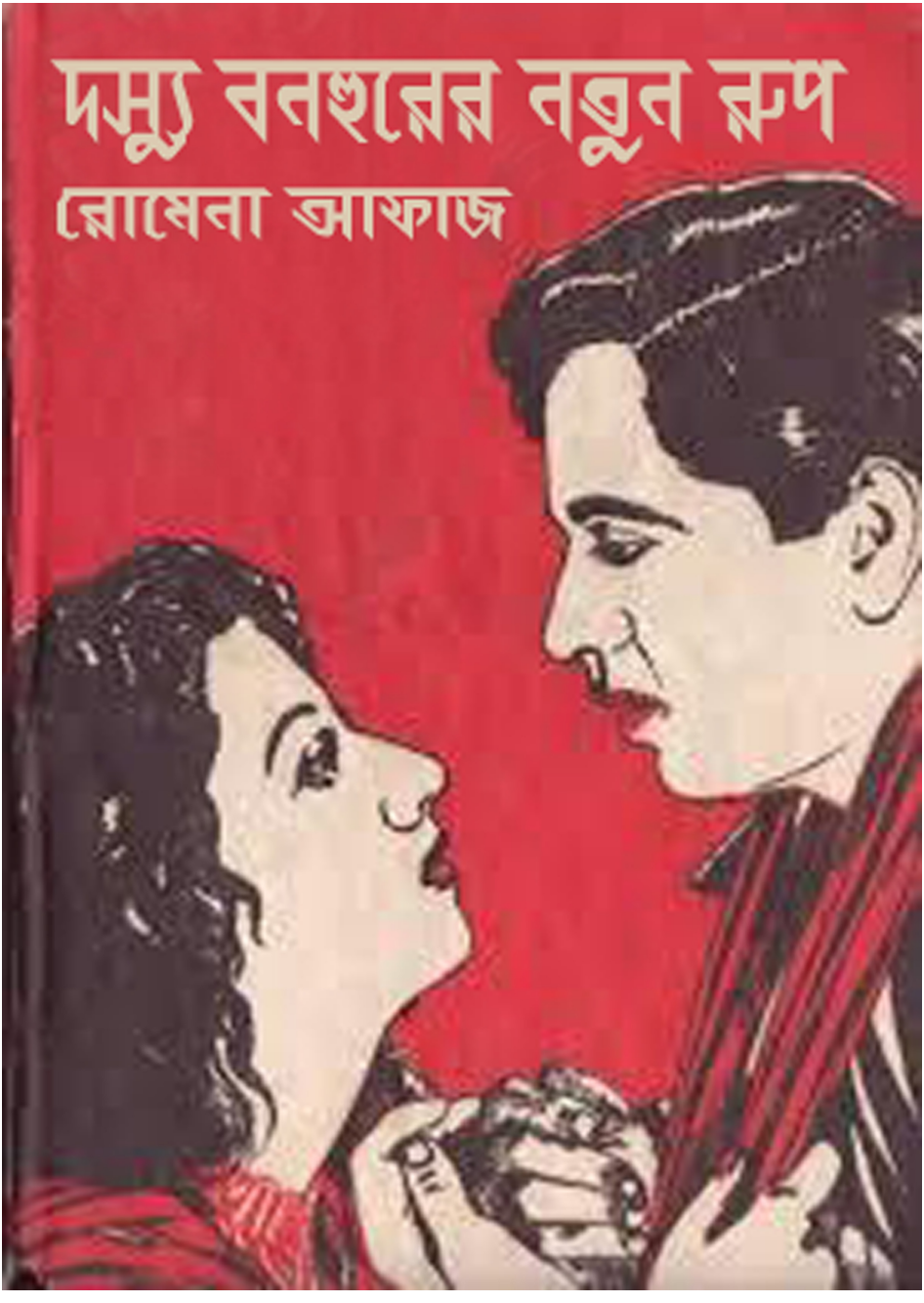
দস্যু বনহুরের নতুন রূপ

রোমেনা আফাজ



প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

মূল্য ৪৫টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১, বি. কে. দাস রোড,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

উৎসর্গ

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

দস্যু বনহুরের নতুন রূপ —২

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

গাঢ় অন্ধকারে গোটা পৃথিবী আচ্ছন্ন। আকাশে দু'একটি তারকা ক্ষুদে বিড়ালের চোখের মত মিটমিট করে জ্বলছে। বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়ছে না। চারদিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অন্ধকারে বিরাট বিরাট গাছ এক একটা দৈত্যের মতই মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ। এছাড়া কোন শব্দই নেই যেন দুনিয়ায়।

অন্ধকারের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে শহরটাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। শহরের বিশিষ্ট স্থানে বিরাট আকাশচুম্বী প্রাচীরে ঘেরা হাঙ্গেরী কারাগার।

সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এই কারাগারের একটি কক্ষে বন্দী দস্যু বনহুর। সশস্ত্র পুলিশ রাইফেল হাতে অবিরত সজাগ পাহারা দিচ্ছে। নিস্তব্ধ কারাগার কক্ষে শুধু জেগে উঠেছে সজাগ প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ—খট্ খট্ খট্।

❑

গভীর রাত।

কারাগারের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং শব্দে রাত দুটো ঘোষণা করলো। মেঝেতে পাতা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো দস্যু বনহুর, নিজ মনে একটু হাসলো সে। তারপর দ্রুতপদে কারাগার কক্ষের পেছন দিকে এগিয়ে গেল। কাপড়ের ভেতর থেকে বের করলো একটা সিলক কর্ড। কর্ডখানা ছুড়ে মারলো দেয়ালের গায়ে প্রায় দশ বারো হাত উঁচুতে ভেন্টিলেটার লক্ষ্য করে। একবার, দু'বার, তিনবার, আটকে গেল কর্ডখানা ভেন্টিলেটারের সঙ্গে। বনহুর আর বিলম্ব না করে কর্ড বেয়ে দ্রুত উপরে উঠতে লাগলো মসৃণ দেয়ালে কিছুতেই পা আটকাচ্ছিল না, অতি কষ্টে উঠতে লাগলো। কারাকক্ষ অন্ধকার, তাই পাহারাদারগণ টেরও পেল না। বনহুর অতিকষ্টে একেবারে ভেন্টিলেটারের পাশে পৌঁছে গেল।

বনহুরের সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে। বার বার হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিচ্ছিলো সে। কর্ডদাঁতে চেপে ধরে ভেন্টিলেটারের শিক হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বনহুর, তারপর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিকে চাপ দেয়। অদ্ভুত শক্তি বনহুরের শরীরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেন্টিলেটারের শিক বাঁকিয়ে

ফেলে সে। একজন বের হতে পারবে, এতটুক ফাঁক করে নিয়ে বনহুর নিঃশ্বাস ফেলে। এবার আর তাকে কে পায়। সে দ্রুত ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে কক্ষের ও পাশে গিয়ে পৌঁছে। বনহুর কর্ডখানা খুলে পুনরায় কাপড়ের নিচে আন্ডার ওয়্যারের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। এবার সে দেয়াল বেয়ে অতি নিপুণতার সঙ্গে নিচে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন পাহারাদার দেখে ফেললো তাকে। বনহুরকে লক্ষ্য করে রাইফেল উঁচু করে গুলি ছুড়লো। বনহুর চট্ করে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আত্মরক্ষা করলো এবং পরক্ষণেই ছুটে এসে জাপটে ধরলো পাহারারত পুলিশটিকে। বলিষ্ঠ হাতের কঠিন চাপে পাহারাদারটির হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে ছুটতে লাগলো সে কারাগারের ফটক অভিমুখে।

রাইফেলের গুলির শব্দে চারদিক থেকে অন্য পাহারাদারগণ শশব্যস্তে ছুটে এলো। মুহূর্তে কারাগারের মধ্যে বন্দী পালানোর সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলো।

বনহুরকে লক্ষ্য করে সমস্ত পুলিশ ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর কখনও থামের আড়ালে, কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে আত্মগোপন করে ফটকের দিকে এগুতে লাগলো।

ইতোমধ্যে গোটা হাঙ্গেরী কারাগার প্রকম্পিত করে বিপদ সংকেত ধ্বনি হতে লাগলো। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হাতে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো।

বনহুর অতি সাবধানে এগুচ্ছে ফটকের দিকে। কয়েকজন পুলিশ উদ্যত রাইফেল হাতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। বনহুর একটা টবের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে রইলো। পুলিশের দল সরে যেতেই আবার এগুতে শুরু করলো সে।

অতি অল্প সময়ে ফটকের নিকট পৌঁছে গেল বনহুর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পুলিশ তার সামনে রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

পেছনে অসংখ্য পুলিশ ছুটে আসছে। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। কালবিলম্ব না করে বনহুর সামনে পুলিশ দু'জনকে লক্ষ্য করে কর্ডটা ছুড়ে মারে। হঠাৎ এমন বিপদের জন্য তৈরি ছিল না পুলিশদয়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল ওরা। তাদের হাতের রাইফেল ছিটকে পড়লো দূরে। বনহুর দ্রুতহস্তে কর্ডখানা ওদের শরীর থেকে খুলে নিয়ে ছুড়ে মারলো ফটকের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ডখানা আটকে গেল। বনহুর কোমরের বেল্টে রিভলভার খানা গুজে রেখে দ্রুত কর্ডবেয়ে ফটকের মাথায় উঠে গেল।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী ফটকের নিকটে পৌছে গেছে। কয়েকজন পুলিশ বনহুরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। কিন্তু তখন বনহুর লাফিয়ে পড়েছে ফটকের ওপাশে।

ফটকের ওপাশে যে দু'জন পুলিশ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিলো, তারা বনহুরকে দেখামাত্র রাইফেল উঁচু করে ধরে। একজন গুলি ছুঁড়ে বনহুরের বুক লক্ষ্য করে, বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়, গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হয় অপর পুলিশের বুকে।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে পুলিশটা।

অপর পুলিশ পুনরার রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়তে যায়, কিন্তু বনহুর তার পূর্বেই রিভলভারের এক গুলিতে পাহারাদার পুলিশকে তার সঙ্গীর সঙ্গে পরপারে পাঠিয়ে দেয়।

তারপর ছুটতে থাকে সম্মুখের দিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ফটক খুলে পুলিশ ফোর্স বেরিয়ে এলো, সবাই ছুটতে লাগলো এদিকে সেদিকে। কোন দিকে গেছে বনহুর কেউ জানে না।

হাঙ্গেরী কারাগারে বিপদ সংকেত ঘণ্টা অবিরাম গতিতে বেজে চলেছে।

বনহুর ছুটতে ছুটতে রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

তার পাশ কেটে চলে গেল একটা পুলিশ ভ্যান। ভ্যানে বিশ-পঁচিশজন পুলিশ রাইফেল উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। কার-খানা চলে গেলে বনহুর সোজা হয়ে বসলো।

অল্পক্ষণেই সমস্ত শহরে হাঙ্গেরী কারাগারের বিপদ-সংকেত ধ্বনি ছড়িয়ে ছিল। সবাই আন্দাজ করে নিল নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

বনহুর বন্দী হওয়ার গোটা শহরে একটা শান্তি ফিরে এসেছিল। আবার নগরবাসীদের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে পড়লো।

বনহুর ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে কোন গাড়ির প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ইতোমধ্যে আর একটি পুলিশ ভ্যান সে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বনহুর হামাগুড়ি দিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ যদি কোন পুলিশ তাকে দেখে ফেলে, তাহলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে হাঙ্গেরী কারাগারকক্ষে।

বনহুর এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে দেখছে। হঠাৎ দেখতে পেল স্টেশনের দিকে থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ি সে পথে এগিয়ে আসছে। হয়তো বা কোন ট্রেনযাত্রী হবে। গাড়ির সামনে বেডিংপত্র রয়েছে।

বনহুর এ সুযোগ নষ্ট করলো না। পথের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে। লাইটপোস্টের ক্ষীণালোকে দেখল কোচোয়ান গাড়ির ওপরে বসে লাগামটা শক্ত করে ধরে আছে। তার দক্ষিণ হাতে চাবুক। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে চাবুকখানা সপাং করে গিয়ে পড়ছে।

গাড়িখানা বনহুরের পাশে আসতেই সে ক্ষিপ্র হস্তে গাড়ির দরজা ধরে পাদানীতে উঠে দাঁড়ায় এবং এক মুহূর্তে বিলম্ব না করে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে।

গাড়ির ভেতরে একটি যুবক বসে বসে ঝিমাচ্ছিল। বনহুর তাকে কিছু বুঝার সময় না দিয়ে তার মুখটা শক্ত করে চেপে ধরলো। সে লক্ষ্য করলো যুবকটা হিন্দু, কারণ তার শরীরে ধুতি আর পায়জামা। এতে বনহুরের সুবিধা হলো, ধুতির আঁচল দিয়ে অতি সহজেই যুবকটিকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো। পূর্বেই যুবকের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে গুঁজে দিয়েছিল সে তার মুখের মধ্যে, কাজেই যুবক একটু শব্দও করতে পারল না। যুবকের হাত-পা মজবুত করে বেঁধে গাড়ির মেঝেতে ফেলে দেয় বনহুর।

কোচোয়ান একবার চিৎকার করে বলে—বাবু, অত নড়াচড়া করছেন কেন?

বনহুর একটু কেশে জবাব দেয়—বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে, তাই দরজা জানালার শার্শী লাগিয়ে দিচ্ছি।

কোচোয়ান আর কোন কথা বলে না।

বনহুর অতি সহজেই কাজ সমাধা করে ফেললো। এবার বনহুর দেখতে পেল, গাড়ির মধ্যে একটি সুটকেস রয়েছে। বনহুর যুবকের পকেট থেকে চাবি নিয়ে সুটকেসটা খুলে ফেললো। যুবকের পকেটেই একটা ম্যাচ ছিল, বনহুর ম্যাচ জ্বেলে দেখলো তার মধ্যে যুবকের প্যান্ট—শার্ট-কোট রয়েছে। আরও অনেক কিছু রয়েছে সুটকেসে। বনহুর চটপট প্যান্ট-শার্ট আর কোট গায়ে পরে নিল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বনহুরের মতই ছিল যুবকটির শরীরের মাপজোক, তাই কোন অসুবিধা হলো না। কিন্তু এবার বিপদে

ছিল সে। প্যান্ট-সার্ট-কোটতো হলো, কিন্তু জুতো যে নেই তার পায়ে। হঠাৎ খেয়াল হলো যুবকের পায়ে নিশ্চয়ই জুতো আছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে যুবকের পা থেকে জুতো খুলে নিল, মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো, জুতো জোড়া যদি তার পায়ে না হয়, তবে মহা মুশকিল হবে। বরাত ভালো তাই জুতো জোড়াও তার পায়ে মাপমত হয়ে গেল।

আসনে বসে হ্যাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর। তাদের গাড়ির পাশ কেটে আরও কয়েকখানা পুলিশ ভ্যান চলে গেল। হাসলো বনহুর। গাড়িতে বেডিংপত্র দেখে ফোর্স কোনরূপ সন্দেহ করেনি।

তখনও দূর থেকে ভেসে আসছে হাঙ্গেরী কারাগারের বিপদ সংকেত ধ্বনি।

বনহুরকে নিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গাড়িখানা একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন এক পৌঢ় ভদ্রলোক। ব্যস্তকণ্ঠে তিনি ডাকাডাকি শুরু করলেন—ওরে মহেন্দ্র! ওরে মাধু। জামাইবাবুর গাড়ি এসেছে। ওরে জামাইবাবুর গাড়ি এসেছে।

বনহুর চমকে উঠলো সর্বনাশ, সে তাহলে জামাই বনে গেল। কিন্তু এখন কোন উপায় নেই, তাকে জামাই সেজেই চালিয়ে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি যুবকের গলায় জড়ানো মাফলারটা খুলে নিয়ে বেশ করে জড়িয়ে নিল নিজের গলায়। তারপর একটু কেশে বলেন—অত চেঁচামেচি করবেন না, ঠাণ্ডা লেগে মাথাটা বড্ড ধরেছে। তারপর কোচোয়ানকে লক্ষ্য করে বলে—এই! তুমি বেডিং পত্রনামিয়ে একটু ভেতরে পৌছে দাও।

কোচোয়ান তার আসন থেকে নেমে বেডিংপত্র নামাতে শুরু করে। বনহুর নিজের হাতে সুটকেসটা নামিয়ে নেয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আহ, থাক থাক। ওরে মহেন্দ্র! এদিকে আয় না, জামাই বাবু নিজেই তো জিনিসপত্র নামিয়ে নিচ্ছেন।

মহেন্দ্র নামে যে লোকটি এসে হাজির হল, সে তখন নিদ্রার ঘোরে চোখ রগড়াচ্ছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বনহুরের হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে মহেন্দ্রের হাতে দিয়ে বলেন—যা, ভেতরে নিয়ে যা, আর শুন, কোচোয়ানকে দেখিয়ে দে বেডিংপত্র কোথায় রাখবে। তারপর বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে—এসো বাবা এসো।

বনহুর ভদ্রলোকটিকে অনুসরণ করে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—আচ্ছা বাবা, গণেশ বলে কাউকে স্টেশনে দেখনি। সে কই?

বনহুর খানিকটা কেশে নিয়ে বলে—কই, কাউকেই তো স্টেশনে দেখলাম না।

তবে নিশ্চয়ই বেটা কোথাও শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ভাগ্যিস বাসার ঠিকানাটা তোমাকে ভালভাবে জানিয়ে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, সেজন্যই বেশি বেগ পেতে হলো না!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠেন—ট্রেনে বুঝি খুব ঠাণ্ডা লেগেছে।

হ্যাঁ।

তাই তো গলাটা যেন কেমন শুনা যাচ্ছে।

বনহুর আঁতকে উঠে বারবার কাঁশতে শুরু করে। তারপর কাশি থামিয়ে বলে—উঃ গলাটা বড্ড ব্যথা করছে।

উঠানে পৌঁছতেই কয়েকজন মহিলা ঘিরে ধরলো বনহুরকে, প্রৌঢ় ভদ্রলোক একজন অর্ধবয়সী মহিলাকে দেখিয়ে বলেন—উনি তোমার শাশুড়ী মাতা।

বনহুর থতমত খেয়ে কি করবে ভাবছে, হঠাৎ মনে ছিল হিন্দুরা গুরুজনকে প্রণাম করে। বনহুর নত হয়ে বয়স্ক মহিলার পদধূলি গ্রহণ করলো।

মহিলা বনহুরের মাথায় হাত রেখে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

মহিলাগণ কানাকানি শুরু করেছে, শুনতে পেল বনহুর—মাধুরীর বর তো খুব সুন্দর হয়েছে। চমৎকার ছেলে, যেন কার্তিক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন—আমি আগেই বলেছিলাম, আমার পছন্দ আছে ।

বনহুর ভেতরে ভেতরে বিব্রত বোধ করতে লাগলো। সে জীবনে অনেক কঠিন বিপদ হাসিমুখে জয় করেছে, কিন্তু কোনদিন এমন বিপদে পড়েনি। একেবারে জামাই বনে গেছে। যাক তবু এতক্ষণ ঠিকভাবে চালিয়ে নিতে পেরেছে এই যথেষ্ট। কিন্তু এরপর আরও যদি কিছু সমস্যা এসে যায়, তখন তার উপায় কি হবে? এক্ষুণি ইচ্ছা করলে পালাতে পারে সে। শত শত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে যে অদৃশ্য হতে পারে, তার কাছে

সামান্য ক'জন নিরীহ প্রাণী এ কিছু নয়, কিন্তু হঠাৎ এদের কাছে নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারে না। কাজেই নিশ্চুপ থেকে যায়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে ওঠেন—মাধুরী কই? ঘুমিয়েছে বুঝি। মহিলাদের একজন বলে ওঠেন—জামাইবাবু আসবেন বলে এতক্ষণ সে জেগেই ছিল। এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওকে ডাকছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—তাই ডাকো বৌমা, ঘুম ভাঙ্গলে দেখবে কে এসেছে।

মহিলা ডাকতে ডাকতে কক্ষের দিকে চলে যান—মাধুরী দি মাধুরী দি, দেখো গিয়ে কে এসেছে।

বনহুর ঢোক গিললো। এইবার তার চরম পরীক্ষা। মাধুরী তবে ঐ যুবকের স্ত্রী। এবার তার সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু এতক্ষণেও তাকে এ বাড়ির কেউ চিনতে পারছে না। ব্যাপার কি? আশ্চর্য লাগে বনহুরের কাছে।

প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা বলেন—পথে কোন কষ্ট হয়নি তো বাবা?

না, শুধু ঠাণ্ডা লেগে গলাটা যা বসে গেছে। কথাটা বলেন বনহুর।

ভদ্রলোক ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন—এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েই কথা বলবে, না ঘরে নিয়ে বসাবে?

শাশুড়ী বলে ওঠেন—দেখ বাবা, আমরা তো তোমাকে দেখিনি। এমন কি এ বাড়ির কেউ তোমাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি। মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে দিদি বিয়েটা দিয়ে দিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—কেন জামাই কি অপছন্দ হয়েছে?

বলো কি জামাই অপছন্দ হবে, এ যে সোনায় সোহাগা। যেমন মাধুরী তেমনি বারা নিমাই।

এতক্ষণে জামাইয়ের নামটা জানতে পারে বনহুর। সে যুবকের নাম তবে নিমাই। হ্যাঁ, তাকে কিছুক্ষণের জন্য নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আর একটি কথা তাকে অনেকটা হালকা করে এনেছে, এ বাড়ির কেউ জামাইকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি। কিন্তু মাধুরী, সে তো নিশ্চয়ই তার স্বামীকে ভাল করে চেনে।

বনহুরকে ভাবতে দেখে বলেন ভদ্রমহিলা—কি ভাবছো বাবা, দিদি যা করেছেন খুব ভালো করেছেন। আমি ভাবতেও পারিনি এমন জামাই পাবো।

ভদ্রলোক বলেন—তোমার দিদির পছন্দ তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমার মাধুরীর স্বামী যেন রাজপুত্র। দেখ বাবা, মনে কিছু করো না,

মাধুরীকে বিয়ের দিনই নিয়ে না এলে ওর ঠাকুরমার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখাই হত না।

বনহুর ব্যথিত-কণ্ঠে বলে ওঠে—ঠাকুরমা তাহলে....

হ্যাঁ বাবা, তিনি মারা গেছেন, কেন তুমি চিঠি পাওনি?

বনহুর একটু চিন্তা করার ভান করে বলে—চিঠি, কই না তো তিনি কি সে দিনই....

হ্যাঁ, মাধুরীকে নিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছলাম, তার ঘণ্টাকয়েক পরেই মা মারা যান। মাধুরীও বুঝি তোমাকে একথা লিখে জানায়নি?

না।

তবে তোমাকে সব গোপন করে গেছে দেখছি। হঠাৎ কথাটা জানালে ব্যথা পেতে পারো তাই বুঝি মাধুরী লেখেনি।

বনহুর লক্ষ্য করলো ওপাশের দরজায় একটা সুন্দর মুখ ভেসে উঠে আবার আড়ালে সরে গেল।

মহিলাটি বলে ওঠেন—মাধুরী জেগেছে, যাও বাবা, ও ঘরেই খাবার পাঠিয়ে দেব। সব ঠান্ডা হয়ে গেছে কিনা, একটু গরম করে দিন।

বনহুর বলে ওঠে—না না, রাতে আর কিছু খাব না। বড্ড অসুস্থ বোধ করছি।

তাহলে একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না না, কিছু খাবো না।

শ্বশুর মহাশয় বলে ওঠেন—সেকি হয় বাবা? রাত্রে উপোস দিতে নেই। তুমি যাও বাবা, ঠাণ্ডায় অসুখ বাড়বে।

বনহুর ইতস্ততঃ করছে বলে একটি যুবতী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে—লজ্জা করছে, না? আসুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

বনহুর যুবতীর পেছনে চলতে চলতে ভাবে—তাদের জামাইয়ের এই প্রথম শ্বশুরালয়ে পদার্পণ। এ বাড়ির এক শ্বশুর মহাশয় ছাড়া জামাইকে কেউ বুঝি দেখে নি। তবু শ্বশুর মহাশয়ের চোখেও পাওয়ার ওয়ালা চশমা। কিন্তু জামাইবাবুর স্ত্রী সে তো তার স্বামীকে সহজেই চিনে নেবে। তখন পেছন থেকে যুবতীটি বলেন—এবার যান, সোজা ভেতরে চলে যান....

বনহুর থমকে দাঁড়ায়, কেশে নিয়ে বলে—আজ না হয় রাতের মত অন্য ঘরে।

কথা শেষ করতে দেয় না যুবতী—রাগ দেখছি আপনার পড়েনি। বিয়ের রাতেই মাধুরী চলে এসেছিল বলে এখন অভিমান। যান যান, ভেতরে যান।

বনহুর দেখলো বেশি আপত্তি করা ঠিক হবে না ধীরে পদক্ষেপে মাধুরীর কক্ষে প্রবেশ করে। দেখতে পায় লজ্জায় জড়োসড়ো একটি যুবতী মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে খাটের একপাশে।

বনহুর বিব্রত বোধ করে। একি অদ্ভুত পরীক্ষায় ছিল সে। নিজেকে সংযত করে একটু কেশে নিয়ে বলেন—মাধুরী

ঘোমটার ফাঁকে লজ্জা ভরা দৃষ্টি তোলে একবার তাকালো মাধুরী তার দিকে।

বনহুর আরও এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। তারপর বলেন— আছো-তো মাধুরী?

মাধুরী মৃদু মধুর কণ্ঠে বলেন—আছি।

বনহুরের মত বীরপুরুষও ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলো। এবার কি কথা বলবে সে? একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হলো, মাধুরী তাকে এখনও চিনতে পারেনি। নইলে সে এতক্ষণ অমনভাবে নিশ্চুপ থাকতো না।

বনহুর খাটে না বসে একটা সোফায় বসে পড়ে বলেন—হঠাৎ ভয়ানক সর্দি-কাশি হওয়ায় গলাটা কেমন বসে গেছে।

মাধুরী আড়নয়নে একবার বনহুরকে দেখে নিল, তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়ালো তার পাশে—ওগো তোমার রাগ পড়েছে?

বনহুর চটপট কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। কাশতে শুরু করে, পরে কাশি থামিয়ে বলে—রাগ করে আর কতদিন থাকা যায় বল।

মাধুরী ঘোমটা অনেকটা সরিয়ে ফেলেছে। আরও ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দভরা কণ্ঠে বলে—সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি এত অল্প সময়ে তুমি এতটা বদলে যাবে। বিয়ের রাতের কথাটা আজও আমার মনে আছে। বাসর ঘরে যাবার পূর্বেই মায়ের চিঠি বাবার হাতে এসে পৌছলো—ঠাকুর মার অসুখটা ভয়ানকভাবে বেড়েছে, দেখা করতে হলে রাতের ট্রেনে আসবে। তুমি তো রেগে অস্থির, বিয়ের রাতে কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না। দেখ দেখি সেদিন যদি বাবার সঙ্গে আমি না আসতাম, ঠাকুরমার সঙ্গে আর জীবনে দেখা হত না।

বনহুর অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। এবার সে বুঝতে পারলো এখানে ঠাকুরমার অসুস্থতার জন্য মাধুরীকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঠাকুরমার অসুস্থতার জন্যই বিয়েতে মেয়ের মা ও বাড়ির কেউ যেতে পারেনি। শুধু মেয়ের বাবা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিয়েটা দিয়ে এসেছেন। এমন কি বিয়ের রাতেই মাধুরীসহ তার পিতাকে চলে আসতে হয়েছিল, মাধুরী ভালো করে স্বামীকে দেখার সুযোগও পায়নি। মনে মনে খুশি হলো বনহুর।

বনহুর মাধুরীর কথায় দুঃখভরা কণ্ঠে বলেন—ঠাকুরমার মৃত্যুতে আমিও ভীষণ দুঃখিত, মাধুরী।

সে কথা তোমার চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

মাধুরী অলক্ষ্যে দেয়ালঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় বনহুর। রাত ভোর হবার আর মাত্র ক'ঘণ্টা বাকী। হাই তোলে বনহুর—মাধুরী, অনেক রাত হয়েছে। শরীরটাও ভালো লাগছে না, একটু ঘুমাবো।

বেশ তো শুয়ে পড়ো। মাধুরী নিজ হাতে বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিতে থাকে। মাধুরীর মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। বনহুর নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো মাধুরীর মুখের দিকে । মাধুরী সুন্দরী বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে জামাটা খুলে মাধুরীর হাতে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ছিল। ইস, আজ ক'দিন এমন নরম বিছানায় শোয়নি বনহুর। কারাগারের কঠিন মেঝেতে আজ তিন চারটা দিন কেটেছে। ভাগ্যিস রহমান বুদ্ধি করে কড়টা তার নিকটে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কর্ডটা তার অনেক উপকারে এসেছে। তাছাড়া বনহুরকে আটকে রাখে এ কার সাধ্য।

মাধুরী আলনায় জামাটা রেখে বিছানায় এসে বসে। বনহুর ঘেমে ওঠে ভয়ে নয় সঙ্কোচে, মিথ্যা অভিনয় তাকে করতে হচ্ছে।

মাধুরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

উভয়ে নীরবে তাকিয়ে রইলো উভয়ের দিকে। মাধুরীর মনে কত আশা—আনন্দ, স্বামী তাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেবে কিন্তু একি, এমন তো সে আশা করেনি।

মাধুরী বলে ওঠে—অমন করে কি দেখছো?

বনহুর হেসে বলে—তোমাকে। সত্যি মাধুরী তুমি কত সুন্দর। কথাগুলো বলে নিজেই লজ্জাবোধ করে সে।

মাধুরী যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বনহুর ততই সরে যায়। নিজকে মাধুরীর নিকট থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখে সে।

মাধুরী কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে খুব ব্যথা অনুভব করলো। কই, এ পর্যন্ত তাঁর স্বামী তো তাকে কোন সাদর সম্ভাষণ জানালো না। তবে কি এখনও তার মনে অভিমান দানা বেঁধে রয়েছে। মাধুরী বনহুরের বুকে মাথা রাখলো—ওগো এখনও তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারলে না।

বনহুর নিজকে সংযত করে রাখে। হাত দু'খানা দিয়ে নিজের মাথার চুলগুলো এটে ধরে বলে—মাধুরী, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি, তাই....

বুঝেছি ঘুম পাচ্ছে তোমার।

হ্যাঁ মাধুরী।

কিন্তু আমার যে ঘুম পাচ্ছে না। কতদিন তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি।

আমি তা জানি মাধুরী। কিন্তু আমার মাথাটা এত ধরেছে তোমায় কি বলবো....

বেশ তুমি ঘুমোও, আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

বনহুর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলো।

মাধুরী বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল বুলিয়ে চললো। কক্ষের স্বল্প আলোতে মাধুরী বনহুরের মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলো। সেদিন স্বামীকে এমন করে দেখার সুযোগ ঘটেনি তার। এত কাছে—এত ঘনিষ্ঠ করেও পায়নি। তবে শুভদৃষ্টির সময় দেখেছিল একটু। কই, সেদিন তো তার স্বামীকে এত সুন্দর বলে মনে হয়নি। অপূর্ব অপরূপ তার স্বামী। আনন্দে মাধুরীর হৃদয় ভরে ওঠে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে মাধুরী বনহুরের মুখে।

বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে মাধুরী। বনহুরের একটু তন্দ্রামত এসেছিল, সজাগ হয় সে। রাত ভোর হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। বনহুর চোখ মেলে তাকালো। মাধুরী তার গায়ের উপর হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বনহুর মাধুরীর হাতখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে রেখে উঠে বসলো। তারপর দ্রুতহস্তে পাশের বন্ধ জানালা খুলে ফেললো। এবার ফিরে তাকালো সে মাধুরীর ঘুমন্ত মুখে। তারপর টেবিলের পাশে গিয়ে একখণ্ড কাগজ আর

কলম তুলে নিয়ে খচ খচ করে লিখল, "বিপদে পড়ে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ক্ষমা করো মাধুরী।"

—দস্যু বনহুর

কাগজখানা টেবিলে ভাজ করে চাপা দিয়ে রেখে মুক্ত জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছিল বনহুর অন্ধকারের অন্তরালে।

❑

পুত্রশোকে চৌধুরী মাহমুদ খান আর মরিয়ম বেগম অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এতদিন তারা জানতেন মনির মরে গেছে! আর সে কোন দিন ফিরে আসবে না। হঠাৎ সে পুত্রকে অভাবনীয় অবস্থায় ফিরে পেলেন চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগম। কিন্তু এমন পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই ছিল তাঁদের পক্ষে ভালো।

মরিয়ম বেগম তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন, সদাসর্বদা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললেন। যে পুত্র ছিল তার জীবনের নয়নের মণি, যাকে হারিয়ে তিনি নিজেকে সর্বহারা মনে করতেন, সে হৃদয়ের নয়নের মণি, মনিরকে ফিরে পেয়ে আবার হারালেন। শুধু হারালেন নয়, নিজের হাতে তাকে বিসর্জন দিল।

স্ত্রীর অবস্থা দর্শনে চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব। তিনি নিজেও মনিরের জন্য অত্যন্ত কাতর ছিল। কিন্তু মনের ব্যথা মনে চেপে নিশ্চুপ রয়ে গেল। কোন উপায় নেই ওকে বাঁচাবার। চৌধুরী সাহেব সবচেয়ে বড় দুঃখ পেলেন, তাঁর পুত্র আজ ডাকু। সভ্য সমাজে তার কোন স্থান নেই।

মনিরা যে বনহুরকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, এ কথা বুঝতে পেরেছিল মামুজান আর মামী মা। বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় মনিরার হৃদয়েও যে ভীষণ আঘাত লেগেছে জানেন তাঁরা। চৌধুরী সাহেব লক্ষ্য করেছেন সেদিনের পর থেকে মনিরার মুখের হাসি কোথায় যেন অন্তর্ধান হয়ে গেছে। সর্বদা বিষণ্ন হয়ে থাকে সে।

অহরহ মনিরা নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে শুধু বনহুরের কথা ভাবে, কিছুতেই সে বনহুরকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে না। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে মনিরা বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানার দিকে। নির্মল দীপ্ত

দুটি চোখ কি সুন্দর!.আজও ঐ দুটি চোখের চাহনি মনিরার হৃদয়ে গেঁথে আছে। বনহুর বন্দী হয়েছে সত্য কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য মনিরা তাকে বিস্মৃত হতে দেখেনি।

চৌধুরী সাহেব পুত্রশোকে মুহ্যমান। মরিয়ম বেগম শয্যাশায়ী, মনিরার অবস্থাও তাই। গোটা চৌধুরী বাড়ি একটা নিস্তব্ধতা ও বিষাদে ভরে উঠেছে। কোথাও যেন এ বাড়িটার এতটুকু আনন্দ নেই।

চৌধুরী সাহেব সেদিন নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে পুত্র সম্বন্ধেই চিন্তা করছিল। নৌকাডুবির পর মনির কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে সে জীবনে বেঁচে আছে,কে তাকে লালন-পালন করলো, লেখাপড়া শিখে মানুষ না হয়ে, কেমন করে হলো সে ডাকু—

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম। বিষণ্ন মলিন মুখ মণ্ডল। স্বামীর পাশের সোফায় বসে বলেন—ওগো, বাছাকে উদ্ধারের কোনই কি উপায় নেই?

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল—না।

তারপর উভয়েই নীরব, গোটা কক্ষে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মরিয়ম বেগম পুনরায় স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন—কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই মানছে না।

জানি, কিন্তু কোন্ উপায় নেই।

নাগো ও কথা বলো না। তুমি একবার ইন্সপেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করে—

অসম্ভব। একটা ডাকাতের জন্য আমি নিজেকে হেয় করবো?

ডাকাত হলেও সে আমাদের সন্তান।

তুমি কি পাগল হলে মরিয়ম? আমার পুত্র বলে দোষীকে তারা ছেড়ে দেবে না। ন্যায্য বিচারে তার যে দণ্ড হবে, তাই মেনে নিতে হবে।

ওগো, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমার মনিরের যদি যাবৎ জীবন কারাদণ্ড হয়....

শুধু কারাদণ্ড নয়, তার ফাঁসিও হতে পারে।

বাপ হয়ে তুমি এ কথা মুখে আনতে পারলে? ওগো, আমার মণিকে তুমি বাঁচিয়ে নাও।

মনিরা কখন আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে মামা-মামীমার কথাবার্তা শুনছিল কেউ জানে না। চৌধুরী সাহেবের শেষ কথায় মনিরা দু'হাতে বুক চেপে বসে পড়ে মেঝেতে। বনহুরের ফাঁসি হতে পারে—

আর সহ্য করতে পারে না মনিরা। উঠে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে ফিরে যায়। দেয়াল থেকে—বিছানা খানা নিয়ে দু'হাতে বুকে চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলো সে—মনির, আবার কেন তুমি আমার জীবন পথে এসে দাঁড়িয়েছিলে?

মনিরার চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠে ফটোখানা।

বনহুর বন্দী হয়েছে জানতে পেরে নূরীর ধমনীর রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারে না দস্যু বনহুরকে কেউ বন্দী করতে পারে। তখনই নূরী পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে বলে—আমি বনহুরকে উদ্ধার করতে চাই। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

কিন্তু বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান তাকে ক্ষান্ত করে। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—নূরী, উপায় থাকলে আমরা এখনও নিশ্চুপ থাকতাম না। হাঙ্গেরী কারাগার—তা অতি ভীষণ জায়গা। হাজার হাজার পুলিশ ফোর্স অবিরত কড়া পাহারা দিচ্ছে। প্রকাশ্যে সেখানে কোন কিছুই করতে পারা যাবে না। আমি গোপনে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি। তাছাড়া নূরী তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, সর্দারকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

নূরীর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠলো। কিন্তু একেবারে আশ্বস্ত হয় না সে, যতক্ষণ বনহুর ফিরে না আসছে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নয় নূরী।

একদিন দু'দিন করে পাঁচটা দিন চলে গেছে। যে নূরী একটি দিন বনহুরকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে, সে নূরী আজ কদিন বনহুরকে কাছে পায়নি।

শুধু নূরীই নয়, বনহুরের অন্তর্ধানে তার সমস্ত অনুচরবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে গোটা বনভূমি।

সবচেয়ে তাজের অবস্থা দুঃখজনক। বনহুর বন্দী হবার পর তাজ কেমন যেন হয়ে গেছে। ঘাস ছোলা কিছু সে মুখে নেয় না। বনহুর তাজকে নিজ হাতে ঘাস ছোলা খাওয়াতো। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতো। বনহুরের অনুপস্থিতিতে সে অবিরত সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করত। কথা বলতে পারে না তাজ, মনের অবস্থা সে এমনি করে ব্যক্ত করত।

বনহুরের অনুচরগণ তাজের জন্য চিন্তিত হয়ে ছিল। না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বে তাজ। এই অশ্বই হচ্ছে বনহুরের সবচেয়ে প্রিয়।

সেদিন নূরী অনেক চেষ্টায় গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে একটু ছোলা আর ঘাস খাইয়েছে তাজকে, কিন্তু এমনি করে আর ক'দিন ওকে বাঁচানো যাবে।

সর্দারের বিনা অনুমতিতে দস্যুগণ কিছুই করতে পারবে না। তাই তারা নীরব হয়েছে।

নূরী ঝরনার ধারে বসে গান গায়। বনে বনে ঘুরে ঘুরে চোখের পানি ফেলে। যেদিকে তাকায় শূন্য বনভূমি খাঁ খাঁ করেছ। বনহুরকে নূরী নিজের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে। বনহুর ছাড়া আর কেউ যেন নেই ওর। অবশ্য সে কথা মিথ্যে নয়, এ বনে বনহুরই একমাত্র সঙ্গী—একমাত্র সম্বল।

বনহুরকে কেন্দ্র করে নূরী কত আকাশ-কুসুম গড়ে আর ভাঙে বনহুর তার স্বপ্ন—তার সব।

সেদিন নূরী তার নিজের কক্ষে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। কই আজও তো বনহুর ফিরে এলো না। রহমান নিশ্চয়ই কোন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। বনহুরকে না জানি হাঙ্গেরী কারাগারে কি কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে! নূরীর চিন্তার অন্ত নেই। বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে নূরী।

ঠিক এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, নূরীকে বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে ডাকে—নূরী।

মুহূর্তে নূরী চোখ তুলে তাকায়। আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়ে সে বনহুরের বুকে—হুর!

বনহুর নূরীর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—নূরী, খুব কেঁদেছো বুঝি এ কদিন?

হুর, আমার মন বলেছে কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না, তোমাকে বন্দী করে রাখতে কেউ সক্ষম হবে না।

তোমার বিশ্বাস মিথ্যা নয় নূরী। বনহুরকে আটকে রাখে কার সাধ্য। সামান্য পুলিশ বাহিনী বন্দী করে রাখবে আমাকে! হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঙ্গেরী কারগারও বনহুরকে আটকে রাখতে সক্ষম হলো না, নূরী।

নূরী দীপ্ত প্রফুল্ল মুখে বনহুরের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে তার মধ্যে দেখতে পায় এক নতুন রূপ।

❑

চৌধুরী সাহেব, মরিয়ম বেগম এবং মনিরা চায়ের টেবিলের পাশে এসে বসে, সকলের মুখেই বিষণ্নতার ছাপ।

বাবুর্চি চা-নাস্তা পরিবেশন করছিল, এমন সময় বয় খবরের কাগজ এনে টেবিলে রাখে।

একসংগে চৌধুরী সাহেবের এবং মনিরার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে পত্রিকা খানার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়মাখা আনন্দ ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করেন চৌধুরী সাহেব—হাঙ্গেরী কারাগার হতে দস্যু বনহুরের পলায়ন। শত শত পুলিশ বাহিনী তাকে আটকিয়ে রাখতে অক্ষম।

আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মরিয়ম বেগম—সত্যি আমার মনির কারাগার থেকে পালিয়েছে? সত্যি বলছো?

হ্যাঁ গো, এই দেখ? চৌধুরী সাহেব পত্রিকার উপরের পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখাগুলো দেখিয়ে দেন।

মরিয়ম বেগম ইংরেজি জানতেন না, তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন—সমস্তটা পড়ে আমায় বুঝিয়ে বল না গো। আমার মনির কারাগার থেকে পালিয়েছে। না জানি বাছা আমার কোথায় আছে কেমন আছে।

মনিরার চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে। মনির কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ইস কি আনন্দ—কি শান্তি। নিশ্চয় সে আসবে। যেমন করে হউক সে আসবে তার কাছে। মনিরা আনন্দের আবেগে আর স্থির হয়ে বসতে পারে না, ছুটে বেরিয়ে যায় সে। নিজের ঘরে গিয়ে বনহুরের ছোটবেলার ফটোখানা খুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে—ওগো তুমি মুক্ত হয়েছ। জানি কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। কেউ না..

চৌধুরী সাহেব নিজেই সমস্তটা পড়ে নিয়ে স্ত্রীকে মানে করে বুঝিয়ে বলেন। পুত্র-কন্যা যত দোষে দোষীই হউক না কেন, পিতা-মাতার নিকটে তারা স্নেহের পাত্র। কোন পিতামাতাই পুত্র কন্যার অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। মনির আজ দস্যু জেনেও চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম তাকে ঘৃণা করতে পারে না। কারাগার থেকে পালিয়েছে জেনে মনে মনে খুশি হলেন তাঁরা। কিন্তু একেবারে আনন্দ লাভ করতে পারলেন না। কারণ, কারাগার থেকে মনির পালিয়েছে সত্য কিন্তু সে নিরাপদ নয়। অহরহ তাকে পুলিশ বাহিনী খুঁজে ফিরছে। পুলিশ সুপার ঘোষণা করে দিয়েছে, যে দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় এনে দিতে পারবে তাকে লাখ টাকা

পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়াও তাকে একটা বীরত্বপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করা হবে।

❑

মরিয়ম বেগম বার বার খোদার নিকট বনহুরের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন। চোর হউক, ডাকু হউক সে সন্তান। হে খোদা তুমি আমার মনিকে রক্ষা কর। মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন—যে সন্তান মানুষ নামে কলঙ্ক, তার জন্য ভেবে কি হবে বল। মনে কর মনির বেঁচে নেই।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন মরিয়ম বেগম—বাপ হয়ে তুমি এ কথা বলতে পারলে?

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বলেন চৌধুরী সাহেব—সবই আমাদের অদৃষ্ট, নইলে অমন ছেলে ক'জনের ভাগ্যে জোটে। পেয়েও আমরা সে রত্নকে পাইনি।

মরিয়ম বেগম বলেন—সত্যি আমার মনিরের মত কই কাউকে তো দেখিনি। ওগো আমি কেন এ শোক বইবার জন্য বেঁচে রইলাম। আমার হৃদয় যে চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছে। একটিবার ওকে দেখার জন্য মন যে আমার আকুলি বিকুলি করছে।

চৌধুরী সাহেব উঠে পায়চারী শুরু করলেন, হয়তো তাঁর চোখ দুটি ও ঝাপসা হয়ে আসছিল।

গোটা দিনটা মনিরার উদগ্রীবভাবে কাটলো। কতবার আনন্দে অধীর হয়েছে সে, কতবার চোখের পানিতে বুক ভাসলো। তার মনির আজ মুক্ত। তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই সে আসবে। মন বলছে সে আসবে।

কিন্তু সন্ধ্যা গিয়ে রাত এলো। ক্রমে রাত বেড়ে চললো। কই সে তো এলো না। তবে কি মনির আসবে না। হয়তো সে অভিমান করেছে, পিতার ওপর রাগ করেই সে আর এ বাড়িতে আসবে না।

দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মনিরা।

এমন সময় তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। চারদিক ঘন অন্ধকার। বনহুর সম্মুখস্থ জলের পাইপ বেয়ে দ্রুত উপরের দিকে এগিয়ে চললো।

শরীরে কালো ড্রেস, মুখে কালো রুমাল বাঁধা, মাথায় কালো পাগড়ী, পেছনে মুক্ত জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে ছিল সে।

চমকে মুখ তুলে মনিরা। বনহুরকে সে কোনদিন দস্যুর ড্রেসে দেখেনি। বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠে—কে তুমি?

বনহুর এগিয়ে এসে নিজের মুখের বাধা পাগড়ী পরে আচল খুলে সঙ্গে সঙ্গে মনিরা আনন্দধ্বনি করে ওঠে—মনির!

উহু মনির নই, দস্যু বনহুর।

না, আমার কাছে তুমি দস্যু নও। তুমি আমার মনির..মনিরা ছুটে গিয়ে বনহুরের কণ্ঠবেষ্টন করে ধরে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে, আবেগভরা গলায় ডাকে—মনিরা।

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ গুজে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—মনির তুমি আমার।

কিন্তু আমি যে দস্যু?

না না, আমি সে কথা মানব না। তুমি যে আমার সব।

বনহুর মনিরাসহ খাটে গিয়ে বসে। পাশাপাশি বসলো ওরা দু'জনে। মনিরার হাতের মুঠায় বনহুরের একখানা হাত। ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা তার মুখের দিকে। কালো ড্রেসে অপূর্ব সুন্দর লাগছে বনহুরকে। মনিরা তন্ময় হয়ে দেখছে। সে দেখার যেন শেষ নেই।

মনিরার বিস্ময়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে বনহুর। তারপর মনিরার চিবুক ধরে উঁচু করে বলে—মনিরা, তুমি কেন আমায় মায়ার বন্ধনে বেঁধে ফেলছ বল তো?

মনিরার গণ্ড বেরিয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। স্থির কণ্ঠে বলে সে—দস্যু বনহুরকে যদি মায়ার বন্ধনে বাঁধতে পারি, তবে সে হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব।

বনহুর ওকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়, তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে—মনিরা।

মনিরা নিজেকে বিলিয়ে দেয় বনহুরের বাহুবন্ধনে।

বানহুর শান্তকণ্ঠে বলে—মনিরা, তুমিই না একদিন বলেছিলে দস্যু বনহুর মানুষ নয়, সে মানুষ নামে কলঙ্ক। সে কথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

মনির, তুমিও সেদিন বলেছিলে মনে পড়ে—দস্যু বলে সে কি মানুষ নয়। তার মধ্যে কি মানুষের হৃদয় নেই—

মনিরা, আমি জানি দস্যু বলে সবাই আমাকে ঘৃণা করলেও তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারবে না।

তুমি জানো না, তোমার আব্বা-আম্মার মনেও আজ কি ব্যথা গুমরে কেঁদে মরছে। তুমি যে তাদের নয়নের মণি ছিলে, তোমাকে হারিয়ে তাঁদের প্রাণে যে কত আঘাত লেগেছিল, তা তুমি জানো না। আজও তাঁরা তোমার সে শিশুকালের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছেন। আজও তাঁরা ভুলতে পারেননি তোমাকে। মামীমা প্রায়ই তোমার কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেন। মামুজানের প্রাণেও কম ব্যথা নেই। তারপর তোমাকে আবার অভাবনীয়ভাবে ফিরে পেয়ে তখনই নির্মমভাবে হারালেন। মনির, তাদের অবস্থা অবর্ণীয়।

বনহুরের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। ব্যথাভরা সুরে বলে—সব জানি মনিরা, সব বুঝি। কিন্তু আমি যে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি। মনিরা আমি বড়ই হতভাগ্য, তাই অমন দেবতুল্য পিতা-মাতা পেয়েও পাইনি।

মনির, আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।

তা হয় না মনিরা।

তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ করেছিলে আর দস্যুতা করবে না। এরি মধ্যে তুমি ভুলে গেলে সব?

না ভুলে যে কোন উপায় নেই, মনিরা। একটা উন্মত্ত নেশা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমি নিজের জন্য আর দস্যুতা করবো না। কিন্তু শয়তানের শাস্তি, কৃপণের ধন, অহংকারীর দর্প চূর্ণ আমি করবোই। মনিরা শপথ আমি রক্ষা করতে পারলাম না বলে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মনির।

না না, আমি দস্যু বনহুর। আমি দস্যু—এক লাফে বনহুর মুক্ত জানালা দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

স্তব্ধ মনিরা পাথরের মূর্তির মত থ'মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, তার কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো—মনির।

❑

মুরাদের পিতা অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে মুরাদকে জেল থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। কিন্তু মুরাদ মুক্ত হয়ে আবার দুর্দান্ত শয়তান হয়ে উঠলো। মনিরাই হলো তার একমাত্র লক্ষ্য। মনিরাকে তার চাই।

তার দলবল যারা একদিন হোটেল থেকে পালিয়েছিল আবার তারা ফিরে এসে যোগ দিল মুরাদের সঙ্গে। এবার তারা অন্য একটি গোপন স্থানে আস্তানা তৈরি করলো। শয়তান নাথুরাম হলো এই দলের নেতা।

সেদিন নাথুরামের আস্তানায় গোপন এক আলোচনা সভা বসেছিল। মুরাদ একটা উচ্চ আসনে বসেছিল। দলপতি নাথুরাম দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে আর অন্যান্য অনুচর কেউ বা দাড়িয়ে কেউ বা বসে আছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে মুরাদ—যত টাকা চাও তাই দেব তবু মনিরাকে আমার চাই।

নাথুরাম গোঁফে হাত বুলিয়ে বলে—হুজুর, নাথু থাকতে মনিরাকে পাবেন না, এটা কথা হলো না। আমি ওকে এনে দেবই।

মুরাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে শয়তানের হাসি—তুমিই পারবে নাথু, মনিরাকে তুমিই এনে দিতে পারবে।

হ্যাঁ হুজুর, আমার দলের কেউ কমজোর নয়, আপনাকে খুশি করতে আমরা কেউ পিছ পা হবো না।

ধন্যবাদ নাথুরাম। মুরাদ কথাটা বলে নাথুর পিঠ চাপড়ে দেয়। নাথুরামের ভয়ঙ্কর মুখে ফুটে ওঠে এক পৈশাচিক হাসি। নাথুর চেহারা দেখলে মানুষ এমনিতেই ভয় পায়। বলিষ্ঠ চেহারা। আকারে বেঁটে, মাথায় খাটো করে ছাঁটা চুল। চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মত ক্ষুদে কুতকতে। বড় বড় দাঁত বেরিয়ে আছে ঠোঁটের ওপরে। সেকি ভয়ঙ্কর চেহারা দলপতি নাথুরামের।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো নাথুরামের প্রধান অনুচর গহর আলী, নাথুরামকে লক্ষ্য করে সালাম করলো।

মুরাদ হেসে বলেন—এত দেরী হলো কেন গহর আলী।

বিরাট একটি ঝাঁকি দিয়ে হেসে উঠলো গহর আলী—সব খবর নিয়ে তবেই ফিরছি হুজুর। চৌধুরী সাহেবের বেটি মনিরা তার বান্ধবীদের নিয়ে আগামী পূর্ণিমার রাতে নৌকা বিহারে যাবে।

মুরাদের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে ওঠে, একটা আনন্দ সূচক শব্দ করে ওঠে সে—ঐ রাতের জন্য প্রস্তুত থেক নাথুরাম, ঐ দিন আমি মনিরাকে চাই।

নাথুরাম হাতের মধ্যে হাত রগড়ায়—হুজুর, অগ্রিম কিছু টাকা...

হ্যাঁ, এই নাও—পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে ছুঁড়ে দেয় মুরাদ নাথুরামের হাতে—এতে পাঁচ হাজার আছে। মনিরাকে পেলে আরও দেব।

সালাম হুজুর, আপনার অনুগত চাকর আমরা। যা বলবেন তাই করবো।

বেশ, তাহলে আমার সব কথা স্মরণ রেখে কাজ করো। নাথুরাম, মনে রেখো সিংহের মুখের আহার কেড়ে নিচ্ছো তোমরা। দস্যু বনহুর ভালবাসে মনিরাকে।

নাথুরামের বিদঘুটে মুখে একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠলো। বলেন সে —দস্যু বনহুর তো দূরের কথা, ওর বাবা এসেও নাথুরামকে হটাতে পারবে না। নাথুরাম হাত দিয়ে দু'বাহুতে চপেটাঘাত করে।

সমস্ত দলবল হর্ষধ্বনি করে উঠলো— সর্দার নাথুরাম কি জয়। সর্দার নাথুরাম কি জয়।

মুরাদ এবং অন্য সকলে এবার একটা বিরাট গোলটেবিলের চারিদিকে গিয়ে বসে, তারপর চললো বোতলের পর বোতল।

মুরাদ জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠে—নাথুরাম, তোমাদের নৌকা তো ঠিক আছে।

হ্যাঁ হুজুর, নৌকা ছিপনৌকা, বজরা সব ঠিক আছে। আমাদের নৌকাটাই যাতে ওরা ভাড়া করে সে চেষ্টা করবো। আপনি কিছু ভাববেন না হুজুর।

মুরাদ নাথুরামের পিঠ চাপড়ে দেয়—বহুৎ খোশ খবর। নাথু সত্যি তুমি কাজের লোক। কথার ফাঁকে হেউ হেউ করে ঢেকুর তোলে মুরাদ। তারপর সে —কিন্তু আমার নিকটে ওকে কখন পৌঁছাচ্ছ তাই বল?

সে চিন্তা করবেন না হুজুর! আগে সে দিনটা আসুক। আপনার টাকা আর আমাদের মনিরা—কিছু ভাববেন না হুজুর, কিছু ভাববেন না!

কিন্তু কি করে তোমরা তাকে আমার নিকটে পৌঁছাবে একটু শুনাও না, আমার যে বড্ড শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

নাথুরাম এপাশে ওপাশে একটু দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলে—আপনার বজরাখানা সে তিন মাইল দূরে যে বাকটা আছে সেখানে বাঁধা থাকবে।

আমরা মাঝি সেজে চৌধুরী কন্যা এবং তার বান্ধবীগণকে নিয়ে ঝিনাইদাতে নৌকা ভাসাবো । তারপর আমাদের ছিপ প্রস্তুত থাকবে, সে ছিপ নৌকার মনিরাকে নিয়ে একেবারে আপনার বজরায়...

চমৎকার বুদ্ধি এটেছো নাথুরাম একেবারে বিউটিফুল আইডিয়া—কিন্তু খুব সাবধানে, বুঝেছো?

হ্যাঁ হুজুর আর বলতে হবে না। চলো নাথুরাম।

❑

চৌধুরী সাহেব বসে বসে একটা পত্রিকা পড়ছিল। এমন সময় বৃদ্ধ সরকার ফয়েজ সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন। চৌধুরী সাহেব চশমার ফাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন—নৌকা ঠিক করেছেন সরকার সাহেব?

জ্বি হ্যাঁ, নৌকা ঠিক করে তবেই বাড়ি ফিরছি। নৌকা বেশ বড়সড় আর সুন্দর। ভাড়াটা একটু বেশি নেবে।

তা নিক, নৌকাটা তবে বেশ মন মতই পেয়েছেন? দেখুন ঝড় উঠলে কোন ভয়ের কারণে নেই তো?

না, তবে সবই খোদার হাত।

এমন সময় মনিরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলে—মামু জানের শুধু ঝড়ের ভয়।

হ্যাঁ মা, ঝড় আমার জীবনে এক চরম আঘাত দিয়ে গেছে। আচ্ছা মা মনিরা, কত বেড়ানোর জায়গা থাকতে তোমাদের কিনা নৌকা ভ্রমণের সখ চাপলো? আমার কিন্তু মন চায় না নৌকায় কোথাও যাওয়া।

একবার ভয় পেয়েছেন তাই আপনার মনে এ দুর্বলতা মামুজান। তাছাড়া আমি তো একা যাচ্ছিনে। আমরা অনেকগুলো মেয়ে যাব।

কিন্তু খুব সাবধানে থেক মা। খোদা না করুক কোন বিপদে না পড়ো।

মনিরা গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। মনে তার অফুরন্ত আনন্দ। সেদিন বনহুরের নিবিড় আলিঙ্গন তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমস্ত সত্তা যেন বিলীন হয়ে গেছে বনহুরের আলিঙ্গনের মধ্যে। আজও সে নিভৃতে বসে সেদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করে গভীর আনন্দ উপলব্দি করে। সেদিনের সে মুহূর্ত মনিরা জীবনে ভুলবে না। এত কাছে কোনদিন ওকে পায়নি সে যেমন করে সেদিন মনিরা তাকে পেয়েছিল।

মনিরা বিছানায় শুয়ে ডিমলাইটটা জ্বেলে দিল। হঠাৎ তার পাশের টেবিলে একটা তীরফলক এসে গেঁথে গেল, তীরফলকের সঙ্গে এক টুকরা কাগজ বাধা রয়েছে।

মনিরা তীরফলকটা হাতে তুলে কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। কাগজের টুকরায় লেখা রয়েছে, "মনিরা, আজ রাতে আসবো আমি—বনহুর।"

একদিন এই নাম শুনলে হৃৎকম্প শুরু হত মনিরার। মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠতো, আর আজ এই নাম কত মধুর কত আনন্দদায়ক খুশিতে আত্মহারা মনিরা কি করবে যেন ভেবে পায় না। বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানা নিয়ে বার বার দেখতে লাগলো সে। ফুলের মত শুভ্র একটি মুখ, মনিরা ছবিটা গালে-ঠোটে ঘষতে লাগলো।

ক্রমে রাত বেড়ে আসে। মনিরা উদগ্রীব হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে দস্যু বনহুরের। মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে বার-বার তাকায় অন্ধকারে। একসময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে মনিরা, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ। মনিরা ফিরে তাকিয়ে আনন্দ ধ্বনি করে উঠে—মনির এসেছো? ছুটে গিয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে—এসেছো। আজি ক'দিন থেকে তোমার জন্য ব্যাকুল চোখে পথ চেয়ে আছি।

কেন? কেন তুমি আমার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করো মনিরা?

কেন তোমার প্রতীক্ষা করি আজও তুমি জানো না?

নিষ্ঠুর!

তার চেয়েও বেশি। দস্যু কোনদিন দয়া-মায়া জানে না মনিরা।

না না, ও কথা বলো না মনির। তুমি যে আমার কাছে সবচেয়ে উদার মহৎ, স্নেহময়—বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদে মনিরা।

বনহুর বিছানায় গিয়ে বসে।

মনিরা ওর পাশে গিয়ে মাথার পাগড়ী খুলে নিয়ে পাশে টেবিলে রাখে, তারপর নিজেও বসে পড়ে পাশে।

বনহুর ওর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলে—মনিরা, তুমি না বলেছিলে দস্যু বনহুরের নামে হৃদকম্প হয় আমার। আর আজ—বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—আজ তোমার নাম স্মরণে হৃদয় আমার আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে। সত্যি মনিরা, তোমার নামে এত মধু....

তাই নাকি?

হ্যাঁ আচ্ছা, মনির আজ তোমাকে একটা জিনিস দেব, বল নেবে?

তোমার দেয়া কোন জিনিসকেই যে আমি অবহেলা করতে পারি না মনিরা।

বনহুরের একখানা হাত তুলে নেয় মনিরা নিজের হাতে। তারপর নিজ আংগুল থেকে সে হীরার আংটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দেয় বনহুরের আংগুলে।

বনহুর বলে উঠে—একি করছো মনিরা?

হেসে বলেন মনিরা—একদিন তুমি এই হীরার আংটি হরণ করতে এসেই আমার হৃদয় চুরি করে নিয়েছ। আজ সে আংটি গ্রহণ করে তোমার হৃদয় আমাকে দান কর।

উহুঁ, দস্যু বনহুর হৃদয় দান করতে জানে না সে জানে গ্রহণ করতে। আংটি তুমি খুলে নাও মনিরা।

না।

সেদিন যা নেই নি, আজ তা আমি নিতে পারবো না।

মনির, আমার দান তুমি গ্রহণ করতে পারবে না।

আমি অক্ষম মনিরা।

দস্যু বনহুর জীবনে কোনদিন.....

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—দয়ার দান গ্রহণ করে না, এই তো?

হ্যাঁ, সে কথা মিথ্যে নয়।

মনির—এ আমার দয়ার দান? প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এসব কিছুই নেই এর মধ্যে? মনিরার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোঁটা অশ্রু।

মনিরার চোখের পানি দস্যু বনহুরকে বিচলিত করে তোলে।

প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মনিরার চোখের পানি মুছিয়ে দেয়।

মনিরা ওর হাতের উপরে হাত রাখে। অপরিসীম এক আনন্দ তার মনে দোলা দিয়ে যায়। ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় মনিরা দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে বলে—মনিরা, বেশ আমি এটা গ্রহণ করলাম।

বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠে—মনির!

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে বলে—মনিরা।

মনিরা এবার বনহুরের আংটিসহ হাতখানা নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বলে—মনির, সত্যি তুমি অপূর্ব।

উভয়ের নীরবে কেটে চলে কিছুক্ষণ। মনিরা বলে ওঠে একসময়—জানো মনির, পরশু বিকেলে আমরা ঝিনাইদা নদীতে নৌকা ভ্রমণে যাচ্ছি? সঙ্গে থাকবে আমার কয়েকজন বান্ধবী। সত্যি মনির তুমি যদি আমাদের সংগে থাকতে, ইস কত আনন্দ পেতাম।

কিন্তু তোমার সখীরা কি খুশি হত? যদি জানতো দস্যু বনহুর তাদের নৌকায় রয়েছে।

তারা তোমার আসল রূপ জানে না, তাই তোমার নামে তাদের এত আতঙ্ক। সত্যি মনির, একবার তারা যদি তোমায়.....

এমন সময় দরজায় মামীমার কণ্ঠ শুনা গেল—মনিরা দরজা খোল দরজা খোল। ঘরে কার সাথে কথা বলছিস?

মনিরা চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে—মামীমা টের পেয়েছেন।

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বলে—চুপ। তারপর উঠে দাঁড়ায় সে। মনিরার হাতের মুঠা থেকে বনহুরের হাতখানা খসে আসে মৃদুস্বরে বলে—চললাম।

তারপর অন্ধকার জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় দস্যু বনহুর।

মনিরা জানালা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসে দরজা খুলে দেয়।

মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে ব্যস্তকণ্ঠে বলেন—মনি, এ ঘরে কার কথা শুনলাম?

মনিরা চোখ রগড়ে বললো—কই আমি তো এই মাত্র দরজা খুলে দিলাম।

মরিয়ম বেগম বলেন—আমি যে স্পষ্ট শুনলাম, কেউ যেন কথা বলছে?

মনিরা হেসে বলে—তুমি স্বপ্ন দেখছো মামীমা। আমার ঘরে কে আবার কথা বলবে? দুশ্চিন্তায় তোমার মনের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। চলো মামীমা, শোবে চলো।

কি জানি আমি তো জেগেই ছিলাম। হয়তো মনের ভুল সত্যি মা, মনি আমাকে পাগল করে দিয়ে গেছে। কথাগুলো বলতে বলতে বেরিয়ে যান মরিয়ম বেগম।

মনিরা হ্যাঁফ ছেড়ে বাঁচে। দরজা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেয় সে।

❑

মাথার নিচে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বনহুর। পাশে বসে নূরী ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ বনহুরের আংগুলে দৃষ্টি চলে যায় তার। আনন্দধ্বনি করে ওঠে নূরী—হুর, ও আংটি তুমি কোথায় পেলে?

হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলেন বনহুর—উঁহু ওটা আংটি নয়।

তবে কী?

ওটা প্রীতির দান।

প্রীতির দান। কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে?

নূরী, সব জানতে চেয়ো না।

আমাকে বলতে তোমার এত আপত্তি কেন হুর। বল ও আংটি তুমি কোথায় পেলে?

হেসে বলে বনহুর—রাগ করবে না তো?

রাগ। মোটেই না! বল তুমি ঐ আংটি কার নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছ?

কেড়ে নেইনি পরিয়ে দিয়েছে।

মিথ্যা কথা, দস্যু বনহুরের আংগুলে কেউ আংটি পরিয়ে দেবে এত বড় সাহস কার আছে। সত্যি করে বল এ আংটি কোথায় পেলে?

একটি মেয়ে আমাকে উপহার দিয়েছে।

ঠাট্টা কর না হুর।

ঠাট্টা নয় নূরী। উঠে বসলো বনহুর। আংগুলের আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

নূরীর মুখমণ্ডল পরিবর্তন দেখা দেয়। গম্ভীর গলায় বলে—হুর কে সে রানী যে তোমার আংগুলো আংটি পরিয়ে দিতে পারে?

বনহুর উঠে দাঁড়ায়—সব কথা বলা যায় না নূরী।

নূরী আর কোন প্রশ্ন করে না। ধীরে ধীরে উঠে নিজের কক্ষের দিকে চলে যায়। অভিমানে ভরে ওঠে তার মন...একথা কি সত্য? বনহুরকে অন্য কোন নারী আংটি পরিয়ে দিতে পারে? না না, সে সবই সইতে পারে কিন্তু

বনহুরকে অন্য কোন মেয়ে ভালবাসবে, এ সহ্য করতে পারবে না। বনহুর যে তার, ওকে ছাড়া নূরী কাউকে বুঝে না। সে জীবনে এ একটিমাত্র পুরুষকেই চিনে এসেছে। সে হচ্ছে তার জীবনের একমাত্র সাথী। আর ভাবতে পারে না নূরী। বনহুর মিথ্যে কথা বলেছে না-না কোন নারী দস্যু বনহুরকে ভালবাসতে পারে না। সবাই তার নামে আঁতকে ওঠে। হৃদকম্প শুরু হয় তাদের কিন্তু বনহুরকে যদি একবার কোন নারী স্বচক্ষে দেখে সে কিছুতেই ভালো না বেসে পারবে না। ওর মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ আছে যার কাছে সবাই পরাজিত হবে। সত্য কি তবে ওকে কোন নারী....না না, তা হতে পারে না। বনহুর তার। তাকে কোন নারী তার কাঝ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না...ছুটে যায় নূরী বনহুরের কক্ষে।

বনহুর নতুন একড্রেসে সজ্জিত হচ্ছিল। নূরী ছুটে গিয়ে চেপে ধরে ওর জামার আস্তিন—বনহুর ঠিক করে বল, তুমি যা বললে তা সত্যি?

হেসে ওঠে বনহুর—এরই মধ্যে এত ঘাবড়ে গেলে নূরী?

না না, আমাকে তুমি সত্যি করে বল? হুর, আমি সব সইতে পারি কিন্তু তোমাকে হারাতে পারি না... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর কণ্ঠ ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে অশ্রুধারা।

বনহুর আংগুল দিয়ে নূরীর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে—অযথা মন খারাপ কর না নূরী।

বনহুর, বল তুমি যা বললে, সব মিথ্যে?

নূরী, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারিও না? আমার কাছে তোমার কোন অমর্যাদা হবে না।

বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে নূরী—হুর, তুমি আমার!

বনহুর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন হয়তো তার মনে আর একটি মুখ ভেসে উঠেছে।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বলে—যাও নূরী, বল তাজকে প্রস্তুত করতে।

নূরী বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে আসে—তাজ তৈরি আছে হুর।

বনহুর নূরীর রক্তিম গণ্ডে আংগুল দিয়ে মৃদু আঘাত করে হেসে বলে—চললাম নূরী!

নূরী শুধু ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

টানা বারান্দা বেয়ে এগিয়ে যায় বনহুর। তারপর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বিকট আকার ব্যাঘ্র মূর্তির মুখগহ্বরে পা দিয়ে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে আসে তার সম্মুখে। বনহুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই দু'জন লোক তাজকে এনে হাজির করে বনহুর একলাফে চড়ে বসে তাজের পিঠে। তাজ উল্‌কাবেগে ছুটতে শুরু করে।

বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়ে বনহুর। তারপর তাজের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—বাড়ি ফিরে যা তাজ।

এবার বনহুর কিছুটা এগিয়ে যায়।

ওপাশে রাস্তার উপরে একটি মোটরকার অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার বনহুরকে দেখতে পেয়েই গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

বনহুর ড্রাইভ আসনে উঠে বসতেই ড্রাইভার তার পাশে বসে। বনহুর এবার গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

অতি দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিল বনহুর। চোখে আজ তার এক নতুন উম্মাদনা।

ঘাটের অদূরে পাশাপাশি কয়েকখানা ছোট বড় নৌকা বাঁধা রয়েছে। ওদিকের একখানা বড় নৌকা বেশ পরিপাটি করে সাজানো, কয়েকজন মাঝি। বৈঠা হাতে বসে রয়েছে। একজন বলিষ্ঠ মাঝি দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মাথায় পাগড়ী দিয়ে তার মুখের খানিকটা অংশ ঢাকা। চোখেমুখে একটা শয়তানী ভাব উপচে পড়ছে। কিন্তু লোকটা পাগড়ী দিয়ে নিজের মুখটাকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছে, যাতে কেউ তার মুখ সহজে দেখতে না পায়। অন্যান্য মাঝির মাথাতেও এক একটা গামছা বাঁধা। কারও বা মাথায় একখণ্ড কাপড় জড়ানো, যেমন মাঝিদের হয়।

এই নৌকাখানাই মনিরাদের জন্য ভাড়া করা হয়েছে, দাঁড়ীর বেশে যে লোকটা পাগড়ীর আড়ালে মুখটা লুকাতে চেষ্টা করছে, তবে সে ব্যক্তি অন্য কেউ নয়—শয়তান নাথুরাম এবং অন্যান্য মাঝির বেশে তারাই অনুচরবর্গ।

অল্পক্ষণেই একদল বান্ধবীসহ মনিরার গাড়ি এসে দাঁড়ালো ঘাটের অদূরে। গাড়ি রেখে নেমে ছিল সবাই। চৌধুরী সাহেব এবং সরকার সাহেব উভয়ে এসেছেন তাদের সঙ্গে। সরকার সাহেব আংগুল দিয়ে বড়

নৌকাখানা দেখিয়ে দিয়ে বলেন—চৌধুরী সাহেব, ঐ নৌকাখানা আমি মা মণিদের জন্য ভাড়া করেছি।

চৌধুরী সাহেব নৌকা দেখে খুশি হলেন হেসে বলেন—বেশ, বেশ সুন্দর নৌকাখানা তো! বেশ বড়সড়ও সরকার সাহেব। আপনি কিন্তু ওদের সঙ্গেই থাকবেন।

জি হ্যাঁ আমি মা-মনিদের সঙ্গেই যাচ্ছি। কথাটা বলেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মনিরা হাত উঠিয়ে ডাকে—এই মাঝি নৌকা নিয়ে এসো।

মাঝিগণ ব্যস্ত হয়ে নৌকা এগিয়ে আনতে লাগলো। নৌকাখানা খুব বড় হওয়ার একেবারে ঘাটের নিকটে পৌছল না, মাঝিরা একটা তক্তা ঘাট আর নৌকায় পেতে দিল।

মেয়েদের আনন্দ আর ধরে না । সবাই এক এক করে তক্তা খানার ওপর দিয়ে নৌকায় গিয়ে পৌঁছল। মনিরা কিন্তু খুব ভয় হচ্ছিল সে বারবার তক্তাখানায় পা রেখে পা সরিয়ে নেয়। চৌধুরী সাহেব এবং বৃদ্ধ সরকার সাহেব মনিরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেমন করে মনিরা নৌকায় যাবে? অন্যান্য মেয়েরা নৌকায় পৌঁছে হাসাহাসি শুরু করলো। মনিরার অবস্থা দেখে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগলো। কেউ বলেন—মনিরা এত ভীতু। কেউ বলেন—আয় আমার হাত ধরে পার হয়ে আয় মনি। কেউ বলেন—মাঝিদের একজন পার করে নাও না।

মনিরা নিরুপায় হয়ে তাকাচ্ছে মামাজানের মুখের দিকে।

চৌধুরী সাহেব বলে উঠেন, ও মাঝি, ওকে হাত ধরে পার করে নাও, দেখ পড়ে না যায়।

একজন মাঝি এগিয়ে আসতেই অন্য একজন মাঝি তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই এগিয়ে এসে মনিরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মনিরা সঙ্কুচিতভাবে হাতখানা এগিয়ে দিল ওর দিকে। মাঝি মনিরার হাত চেপে ধরে নিবিঘ্নে পার করে নিল। কিন্তু মনিরা নিজের হাতে কেমন যেন একটা মৃদু চাপ অনুভব করলো। মনে মনে ভীষণ রাগ হলো মনিরার। মাঝির হাত থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে নৌকায় একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

মেয়েরা মুখ টিপে হাসলো। একজন মনিরার কাছে মুখ নিয়ে বলেন, মাঝিটার তোর জন্য বড় দরদ।

যা, যত সব ইয়ে!

সরকার সাহেব নৌকায় উঠে বসতেই নৌকা ছেড়ে দিল মাঝিরা।

চৌধুরী সাহেব ঘাট থেকে হাত তুলে বলেন, বেশি রাত করো না মনিরা।

মনিরাও হাত নেড়ে বলল, বেশি রাত করবো না মামুজান, তুমি বাড়ি যাও।

নৌকায় বসে মেয়েদের সেকি আনন্দ। কেউ বা গান গাইতে শুরু করলো, কেউ বা হাসি আর গল্পে মেতে রইল। কেউ বা মাঝিদের হাত থেকে বৈঠা নিয়ে পানি টানতে শুরু করলো।

মনিরা কিন্তু গম্ভীর হয়ে রয়েছে। কারণ মাঝিটার আচরণ এখনও তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কি অসভ্য ঐ মাঝিটা, একটা ছোটলোকের বাচ্চা। কেউ যে ওর হাতে হাত রাখে তাই ভাগ্য। সে কিনা তার হাতে চাপ দিল! ছিঃ বড় লজ্জার কথা, মনিরা সকলের অলক্ষ্যে একবার মাঝিটার দিকে বিষনজরে তাকায়, মাঝিটা যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই মনিরা রাগে অধর দংশন করলো এবং তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

হাসলো মাঝিটা। দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দের সঙ্গে তার মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে মিলিয়ে গেল শুনা গেল না কিছু।

সাথীরা ধরে ফেললো তাকে একটা গান শুনাতে হবে। মনিরা কিছুতেই গাইবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে গাইতেই হলো।

বান্ধবীদের জেদে তার কোন আপত্তিই টিকলো না। মনিরার গানের সুর আর দাঁড়ের ঝুপঝাপ শব্দ মিলে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, ঢেউয়ের বুকে দোল খেয়ে যেন এগিয়ে চলেছে।

গোটা নৌকায় বিরাজ করছে এক অপরিসীম আনন্দ। বৃদ্ধ সরকার সাহেবও মেয়েদের সঙ্গে আনন্দে মাতোয়ারা। মনিরার গানের সুরের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছেন তিনি।

হাসি গল্প আর আনন্দের মধ্যে নৌকাখানা যে অনেক দূরে এসে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই কারো।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র। সমস্ত ঝিনাইদা নদীটা যেন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু আলোর বন্যা।

মনিরা বলে ওঠে—সরকার চাচা এবার নৌকা ফেরাতে বলুন। সরকার সাহেবও বলে উঠলেন—তাইতো, অনেক দূরে এসে পড়েছি আমরা। মাঝি এবার তোমার নৌকা ফেরাও।

মাঝিরা হঠাৎ কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে ছিল। নৌকাখানা যেমন চলছিল তেমনি এগুতে লাগলো বরং গতি আরও বেড়ে গেছে। মনিরা বলে ওঠে, মাঝি নৌকা ফেরাও।

কিন্তু কই তারা যেমন দাঁড় টানছিল, তেমনি নির্বিকারভাবে কাজ করে চলেছে। নৌকা ফেরাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অদূরে দেখা গেল ঝিনাইদার বাঁক। সবাই লক্ষ্য করলো বাঁকের মুখে একখানা বজরা বাঁধা রয়েছে। বজরায় কোন আলো নেই।

জ্যোস্নার আলোতে বজরাখানাকে একটি ভাসমান কুটিরের মত মনে হলো।

এমন সময় নৌকার পেছনে শুনা গেল চাপা একটি কণ্ঠস্বর সব মনে আছে তো?

অপর একটি চাপাকণ্ঠ—আছে হুজুর।

পূর্বের কণ্ঠ মেয়েটিকে ঠিকভাবে চিনে রেখেছিস?

হ্যাঁ, হুজুর....

দাঁড়ের শব্দে কথার আওয়াজগুলো মেয়েদের বা সরকার সাহেবের কানে যায় না।

হঠাৎ দেখা যায় বজরার দিক থেকে একখানা ছিপনৌকা তর তর করে এদিকে এগিয়ে আসছে।

মাঝিদের ভাবসাব লক্ষ্য করে মেয়েরা আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ সরকার সাহেব বারবার বলতে থাকে মাঝি, নৌকা ফেরাও মাঝি নৌকা ফেরাও—

কিন্তু মাঝিরা সে কথা কানেও নেয় না।

মেয়েরা ভয়ার্তস্বরে এটা সো বলাবলি শুরু করলো। কেউ বা কেঁদেই ফেললো।

সরকার বলেন—মাঝি, তোমরা জানো না এ নৌকায় কার ভাগ্নী আছে? শিগগির নৌকা ফেরাও।

ঠিক সে মুহূর্তে দাঁড়ী-মাঝি সরকার সাহেবের বুকের কাছে রিভলভার চেপে ধরে গর্জে ওঠে—জানি এবং তার জন্যই আমরা নৌকা বেয়ে এতদূর এসেছি। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে সবাই চুপ করে থাক। চৌধুরী সাহেবের ভাগ্নী মনিরাকে আমাদের চাই।

ভীষণভাবে শিউরে উঠলো মনিরা। এবার সে বুঝতে পারলো মাঝিদের মনোভাব। কিন্তু মুখে ভয়ের ভাব না এনে বলেন—খুবতো আস্পর্ধা তোমাদের দেখছি। মনিরাকে নেওয়া যত সহজ মনে করছে তত সহজ নয়। শিগগির নৌকা ফেরাও, নচেৎ আমরা সবাই মিলে চিৎকার করবো!

শয়তান নাথুরাম হেসে ওঠে—হাঃ হাঃ হাঃ চিৎকার করবে? এই নির্জন নদীবক্ষে কে শুনবে তোমাদের কণ্ঠস্বর?

অন্য মেয়েরা সবাই পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। কারও মুখে কথা নেই। মনে-প্রাণে সবাই খোদাকে স্মরণ করতে থাকে। ভয়ে সকলের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

সরকার সাহেব বৃদ্ধ, তবু হার মানলেন না, চিৎকার করে বলেন—শয়তান, তোমাদের চক্রান্ত আগে বুঝতে পারলে তোমাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দিতাম।

হুঙ্কার ছাড়ে নাথুরাম—তা যখন পারনি তখন বুড়ো বয়সে পৈতৃক জানটা নষ্ট কর না। সুবোধ বালকের মত নিশ্চুপ বসে থাক।

নিরস্ত্র সরকার সাহেব শুধু চিৎকার করে শাসাতে লাগলেন, তাছাড়া আর কিইবা করবেন তিনি! এতগুলো দস্যুর সঙ্গে পেরে ওঠা তার পক্ষে মুশকিল।

মেয়েদের মধ্যে একটা হুলস্থুল শুরু হয়েছে। কেউ কাঁদছে, কেউ-বা চিৎকার করছে। কেউ বা বলছে—এটা দস্যু বনহুরের নৌকা। সে মনিরাকে চুরি করার জন্য এই ফন্দি এটেছে।

মেয়েরা তো বনহুরের নামে কাঁপতে শুরু করলো! সেকি ভীষণ অবস্থা।

ছিপ নৌকাখানা একেবারে নিকটে পৌঁছে গেছে।

দু'জন বলিষ্ঠ লোক মনিরাকে জাপটে ধরলো। বাধা দিতে গেল সরকার সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে একটা বলিষ্ঠ লোক তার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিল। সরকার সাহেব ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল নৌকায়।

লোক দু'জন মনিরাকে শূন্যে উঠিয়ে নিল, তারপর লাফিয়ে ছিল ছিপ নৌকাখানায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মাঝিগণও ছিপ নৌকায় লাফিয়ে পড়তে লাগলো।

ওদিকে মনিরার বান্ধবীগণ ভীষণ আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। বাঁচাও! বাঁচাও! দস্যু বনহুর আমাদের সর্বনাশ করলো, আমাদের মেরে ফেললো। বাঁচাও বাঁচাও....

মনিরাকে ছিপ নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো দস্যুগণ বজরাখানার দিকে। মনিরাও তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করছে—বাঁচাও বাঁচাও...

মাঝি-বেশি শয়তানের অনুচরের দল ছিপ্ নৌকায় দাঁড় টেনে চলেছে। ওদিকে মনিরার বান্ধবীও আহত সরকার সাহেবকে নিয়ে বড় নৌকাখানা আপন মনে এদিকে ভেসে চললো।

ছিপ নৌকাখানা প্রায় বজরার নিকটবর্তী হয়েছে, এমন সময় সে মাঝি যে মনিরাকে তক্তা পার করে নিতে গিয়ে তার হাতে মৃদু চাপ দিয়েছিল, সে হাতের বৈঠা নিয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। অন্য মাঝিদের ছিপ নৌকাখানা ভীষণ একটা ঘুরপাক খেয়ে গেল।

আচমকা এই বিপদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না শয়তান নাথুরাম, সে রিভলভার উদ্যত করে গর্জে উঠলো কে তুই?

মনিরা জ্যোস্নার আলোতে লক্ষ্য করলো, এ সে মাঝি কিছু পূর্বেও যে মাঝিকে সে মনে মনে অভিসম্পাত করছিল। এক্ষণে মনিরার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, কে এ মাঝি যার প্রাণে এত দয়া? নিশ্চয়ই তাকে বাঁচানোর জন্যেই মাঝিটির এত প্রচেষ্টা।

নাথুরাম মাঝিটার বক্ষ লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে ধরতেই মাঝিটা চট করে সরে দাঁড়ালো, নাথুরামের রিভলভার নিস্তব্ধ নদীবক্ষে গর্জে উঠলো—গুড়ুম।

মাঝিটা নাথুরামকে পুনরায় রিভলভার উদ্যত করতে না দিয়ে ভীষণভবে আক্রমণ করলো। নাথুরাম টাল সামলাতে না পেরে ছিপ

নৌকাখানার মধ্যে পড়ে গেল। মাঝি তার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল নদীবক্ষে।

ততক্ষণে অন্য শয়তানগুলো আক্রমণ করে মাঝিটাকে। চলে ভীষণ ধস্তাধস্তি।

ছোট্ট ছিপ নৌকাখানার উপরে সেকি তুমুল অবস্থা। ভয়ে মনিরার অবস্থা মরিয়া হয়ে উঠলো। এভাবে নৌকা ভ্রমণের জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলো!

সামান্য একটি ছিপ নৌকা এভাবে কতক্ষণ টিকতে পারে। বিশাল নদীবক্ষে ছিপ নৌকাখানা মোচার খোলার মত দুলতে লাগলো। মনিরা ভয়কম্পিত বক্ষে দেখছে এই বুঝি ছিপ নৌকাখানা ডুবে যায়। মনে প্রাণে সে মাঝিটার কামনা করছে। কি আশ্চর্য ওর সঙ্গে এতগুলো শয়তান পেরে উঠছে না। মাঝিটা এক একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে নাথুরামের অনুচরগণকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিন্তু নাথুরাম হটার বান্দা নয়, সে প্রাণপণে মাঝিট্যকে কাবু করার চেষ্টা করতে লাগলো।

হঠাৎ ছিপ নৌকাখানা একপাশে কাৎ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল নদীবক্ষে।

কোথায় গেল মনিরা কোথায় বা নাথুরাম আর শয়তান মাঝিদের দল। যে যেদিকে পারলো সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলো।

মনিরা তলিয়ে যাচ্ছে। সে সাঁতার কাটতে পারে না। বাঁচার কোন উপায় নেই তার। ঢক ঢক করে কিছুটা পানি খেয়ে ফেললো সে। এই ছিল তার অদৃষ্টে। হায় কেন সে আজ নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। মৃত্যুকালে একবার মনে ছিল মনিরের কথা। আর ওর মুখখানা দেখতে পেল না মনিরা। তবু বাঁচার জন্য মনিরা হাত-পা ছুঁড়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

হঠাৎ মনিরা অনুভব করলো কেউ যেন তাকে ধরে ফেলেছে। মনিরা তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। একটা একটা খড়-কুটোও তখন তার কাছে অতি বড় সম্পদ। সে কিছু না ভেবে আঁকড়ে ধরলো শত্রু কিংবা মিত্র ভাবার সময় তখন তার নেই।

মনিরা যখন চোখ মেলে তাকালো তখন একটা উজ্জল আলো তার সামনে ছড়িয়ে ছিল। উঠে বসতে গেল অমনি একটা বলিষ্ঠ বাহু তাকে শুইয়ে দিল।

মনিরা চমকে ফিরে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আপ্লুত কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—মনির।

হাসলো বনহুর, কোন জবাব দিল না।

মনিরা আনন্দের আবেগে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে—তুমি! এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। মনির, কি করে আমি তোমার পাশে এলাম। বল, বল মনির?

হেসে বলেন বনহুর—সে মাঝি তোমাকে আমার নিকটে পৌঁছে দিয়েছে, যে নাবিককে তুমি মনে মনে অভিসম্পাত করেছিলে।

মনিরার চোখে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে, অবাক হয়ে বলে—মনির তুমি কি করে জানলে আমি সে মাঝিকে গালমন্দ দিয়েছিলাম সে মাঝিই বলেছে।

মনিরা আরও অবাক হয়ে বলে—সে কি করে আমার মনের কথা বলবে? জান মনির, সত্যি আমি তাকে অসভ্য বলে মনে মনে গালমন্দ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে না হলে হায় কি যে হত। শয়তান দস্যু দল আমাকে হত্যা করতো।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর—হত্যা করতো না একথা সত্য তোমাকে তারা হরণ করে এক শয়তানের হাতে সমর্পণ করতো-----

উঃ কি সর্বনেশে কথা! মনির, সে মাঝি তোমার কে?

কি তার পরিচয়?

সে আমার বন্ধু।

বন্ধু? মনির আমার হয়ে তুমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। বেচারা আমাকে কত কষ্ট করে বাঁচিয়েছে!

নাহলে তুমি এখন শয়তান মুরাদের হাতে গিয়ে...

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা—মুরাদ!

হ্যাঁ, সে মুরাদ তোমাকে হস্তগত করার জন্য অবিরত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, হাজার হাজার টাকা সে পানির মত খরচ করেছে।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে মনিরা—পাষণ্ড শয়তান....মনির, তোমার মাঝি বন্ধু কত মহৎ।

হ্যাঁ মনিরা, গরীব বলে কখনও কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়, বা অবহেলা করা ঠিক নয়। তাই বলে সবাইকে বিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

মনিরা বনহুরের জামার বোতাম নিয়ে নড়াচড়া করতে করতে বলে—আমি কি জানতাম ওটা ডাকাতের নৌকা। ভাগ্যিস মাঝিটা ছিল, সত্যি তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এক্ষণি তাকে যদি পেতাম...

কি করতে?

হাত ধরে মাফ চেয়ে নিতাম।

বনহুর মনিরার হাতের কাছে হাতখানা বাড়িয়ে দেয়—সে মাঝি তোমার সামনে উপস্থিত মনিরা নাও মাফ চেয়ে নাও।

মনিরার চোখে বিস্ময়, মুখে ফুটে ওঠে স্মিত হাসির রেখা, বলে ওঠে সে—তাই বল। হ্যাঁ, এবার বুঝেছি সব। তাই তো বলি, কোন সে মাঝি যার এত বীরত্ব।

কই মাফ চেয়ে নিলে না আমার কাছে।

মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রেখে চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে বলে—তুমিই এবার আমার নিকটে মাফ চেয়ে নাও। কারণ, একটি যুবতীর হাতে চাপ দেওয়া কম দোষণীয় নয়।

বনহুর আর মনিরা মিলে হাসতে থাকে। বনহুর বলেন—মনিরা, এখানে বেশিক্ষণ থাকা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। বল এবার তোমাকে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়?

মনিরা চারদিকে তাকিয়ে বলে—এখন আমি কোথায় মনির?

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলে—তুমি এখন আমার গুপ্তকক্ষে বন্দী রয়েছ।

কি বললে এটা তোমার গুপ্তকক্ষ?

হ্যাঁ, গভীর মাটির তলায় রয়েছ এখন তুমি।

এ তুমি কি বলছ!

কেন, ভয় হচ্ছে নাকি?

না।

জান মনিরা, এখানে যদি তোমাকে চিরদিন আটকে রাখি কেউ তোমার সন্ধান পাবে না। এখানে শুধু তুমি আর আমি। মনির, তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করতে পারবো।

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

মনিরা বলে—কি ভাবছো!

জবাব দেয় বনহুর—ভাবছি, তোমার মামাজান-মামীমার কথা। তারা এতক্ষণে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন।

কি বললে, আমার মামুজান আর মামীমা? তোমার কেউ নন তাঁরা? বলেন, আব্বা আর আম্মা।

সত্য মনিরা, আব্বা আর আম্মা খুব বুঝি ভাবছেন তোমার জন্য। একদিন ঐ ঝিনাইদার বুকে হারিয়েছিল তাঁর প্রিয় পুত্র মনিরকে। আর আজ সে ঝিনাইদা হরণ করলো তাদের একমাত্র কন্যা সমতুল্যা ভাগ্নী মনিরাকে না না, আর বিলম্ব করা উচিৎ হবে না মনিরা, চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

মনিরাও উঠতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বসে ছিল সে।

বনহুর পুনরায় পাশে বসে বলল—এখনও অসুস্থ বোধ করছো মনিরা?

হ্যাঁ, মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে।

তবে চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাক। আমি এক্ষুণি আসছি।

কোথায় যাবে মনির?

বিশেষ একটা দরকার আছে।

যাও! মনিরা, বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই মনিরা উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো সব। যে কক্ষে সে শুয়েছিল সেটা একটা মাঝারি রকমের ঘর। কক্ষের দেয়াল কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি। কোন আড়ম্বর নেই সে কক্ষে। মেঝের এক পাশে পাথর দিয়ে তৈরি একটা খাট। খাটে দুগ্ধ ফেননিভ কোমল বিছানা, যে বিছানায় সে এতক্ষণ শুয়েছিল। মনিরা বুঝতে পারল ঐ বিছানা দস্যু বনহুরের। কক্ষের একপাশে একটা পাথরের টেবিল। টেবিলে ছোটবড় কয়েকখানা রিভলবার। ওপাশের দেয়ালে ঠেস দেওয়া

রয়েছে বড় বড় ভারী গোছের দুটো রাইফেল। আর একটা টেবিলে কতকগুলো সুতীক্ষ্ণধার ছোরা, অবশ্য সেগুলো সব খাপের মধ্যে আটকানো। মনিরা ধীরে ধীরে সে অস্ত্রগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল। এগুলো বনহুরের ব্যবহার্য অস্ত্র। সবগুলোতে যেন তার হাতের স্পর্শ লেগে রয়েছে।

মনিরা এগুতে লাগলো, দেখতে পেল সামনে একটি দরজা তার ওপাশেই একটা সিঁড়ির মত আরও নিচে নেমে গেছে। মনিরা এক পা দু'পা করে এগুতে লাগলো। সিঁড়ির মুখে গিয়ে অবাক হলো সে, নিচে ঠিক তার পায়ের তলায় একটা হলঘরের মত প্রকাণ্ড একটা ঘর। ঘরের মধ্যে উজ্জল আলো জ্বলছে। মনিরা অবাক হয়ে দেখলো বনহুর একটি উচ্চ আসনে বসে আছে। তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো বলিষ্ঠ লোক, প্রত্যেকের হাতেই এক একটা রাইফেল। মাথায় পাগড়ী কানে বালা, হাতে বালা, গায়ে ফতুয়ার মত আটসাট জামা।

মনিরা স্তব্ধ হয়ে দেখছে লোকগুলো বনহুরের কোন আদেশের প্রতীক্ষা করছে।

কি যেন বলেন বনহুর স্পষ্ট বুঝা গেল না, ভীষণকায় লোকগুলো কুর্নিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর সারিবদ্ধভাবে অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকগুলোর চেহারা দেখে মনিরার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গিয়েছিল। ঠিক যেন একদল রাক্ষসের মধ্যে বনহুর একটি দেবমূর্তি। আশ্চর্য হলো মনিরা, এত ভয়ঙ্কর লোকগুলো বনহুরকে সিংহের মত ভয় করে।

মনিরা এই কথা ভাবছে হঠাৎ শুনতে পেল সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ।

সম্বিৎ ফিরে এলো মনিরার, সে দ্রুত নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে ছিল।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে মনিরার পাশে গিয়ে বসলো। মনিরা নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে এই সে দস্যু বনহুর যার ভয়ে গোটা দেশ প্রকম্পমান। যার নাম স্মরণ করে সবাই আতঙ্কে শিউরে ওঠে। পুলিশমহল যাকে গ্রেপ্তারের জন্য লাখ টাকা ঘোষণা করেছে সেই দস্যু বনহুর তার পাশে। তার অতি প্রিয়জন।

বনহুর হেসে বলল—অমন করে কি দেখছো মনিরা?

তোমার আসল রূপ।

কেমন দেখছো?

অনেক সুন্দর—মনির, সত্যি তুমি আমাকে ভালবাস?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মনিরা?

বল— আমার মন শুনতে চাচ্ছে।

বাসি। মনিরা... অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে মনিরা।

চলো মনিরা, এবার তোমাকে রেখে আসি।

যদি না যাই তোমার খুব অসুবিধা হবে, না।

আমার নয়, তোমার হবে।

কেন? কি করে আমার অসুবিধা হবে?

মনিরা, তুমি শিশু নও। তোমার নিরুদ্দেশ লোকনিন্দার কারণ হবে। আব্বা আম্মা তোমার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। বল তো তখন তাঁদের কত কষ্ট হবে?

মনিরা উঠে দাঁড়ায়, তারপর বনহুরের হাত ধরে বলে— চলো।

চলতে চলতে কথা হয় দুজনের মধ্যে। মনিরা বলে—তুমি না আমার গা ছুঁয়ে শপথ করেছিলে আর দস্যুতা করবে না। পারলাম না আমার কথা রাখতে মনিরা। শয়তান নাথুরাম ভয়ঙ্কর শয়তানী শুরু করেছে।

নাথুরাম—সে আবার কে?

মাঝির ছদ্মবেশে যে তোমাকে হরণ করতে যাচ্ছিলো।

শয়তান নাথুরাম!

হ্যাঁ, সে শুধু শয়তান নয় মনিরা, সে নরপিশাচ। দেখে নিতে চাই শয়তান নাথুরামের কত বাহাদুরি! আজই খবর পেলাম জম্বুরা পর্বতের এক গুহায় তার গোপন আস্তানা রয়েছে। সেখানে নাথুরামের একটি কালি মন্দিরও আছে। মন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় একটি কুমারী কন্যাকে বলি দেওয়া হয়।

মনিরা আর্তনাদ করে ওঠে—উঃ কি ভীষণ কাণ্ড!

শুধু তাই নয় মনিরা, সে আরও অনেক কিছু দুষ্কর্মের সঙ্গে লিপ্ত আছে। আমি ওকে দেখে নেব।

বনহুরের মনোভাব আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল না মনিরা। কিন্তু অনুভব করলো সে মনিরার হাতের মধ্যে বনহুরের বলিষ্ট হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তারপর কিছুদূর নীরবে এগুলো তারা।

এবার এক সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলো মনিরা আর বনহুর। বেশ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। বনহুর মনিরাকে এঁটে ধরলো—মনিরা, সাবধানে আমার হাত ধরে চলবে। পা ফসকে গেলেই মৃত্যু।

মনিরা বনহুরের হাত এটে ধরে চলতে লাগলো।

চলতে চলতে হেসে বলল বনহুর—মাঝি বেচারা তোমার হাতে মৃদু চাপ দিয়েছিল বলে সে তোমার অসংখ্য অভিসম্পাত কুড়িয়েছে, আর এখন...

যাও ঠাট্টা রাখ। মনিরা বনহুরের হাতে হাত রেখে পায়ের দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুরকে জাপটে ধরলো সে। সুড়ঙ্গ পথের আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল, সরু একটা পথ, তার নিচেই হাত দেড়েক দূরে গভীর খাদ। শিউরে উঠলো মনিরা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল—আমি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না মনির, আমাকে তুমি নিয়ে চলো।

বনহুর হেসে বলেন—বেশ, তুমি চোখ বন্ধ করো, ওয়ান, টু, থ্রী—বনহুর মনিরাকে ছোট বালিকার মত দু'হাতের উপর উঠিয়ে নিল। এবার দ্রুত চলতে লাগলো সে। মনিরা দুহাতে নিজের চোখ ঢেকে চুপ করে রইলো।

সুড়ঙ্গের বাইরে এসে মনিরাকে নামিয়ে দিয়ে বলল বনহুর, চোখ যেন খুলে না, পড়ে যাবে।

মনিরা বুঝতে পারলো, এখন সে বেশ প্রশস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মেলে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো—ইস, কি সুন্দর আলো-বাতাস।

একটা মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর আর মনিরা। একি, দিন যে। তবে যে ওখানে অত আলো জ্বলছিল! বুঝতে পারলো মনিরা ওটা মটির নিচে তাই আলোর ব্যবস্থা।

মনিরা সামনে তাকাতে দেখতে পেল অদূরে একটি জমকালো অস্ত্র নিয়ে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর লোক দুটিকে ইংগিত করতেই অশ্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। বনহুর এবার মনিরাকে অশ্বে উঠিয়ে নিয়ে নিজেও চড়ে বসলো। হেসে বল—এর নাম কি জান?

না।

এর নাম তাজ।

বহুদিন নিশীথ রাতে অশ্বখুরধ্বনি কর্ণগোচর হয়েছে। আজ স্বচক্ষে দেখলাম এবং তার পৃষ্ঠে আরোহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। সত্যি আজ আমি গর্বিত।

তাজ এবার উল্‌কা বেগে ছুটতে শুরু করলো। বনহুর মনিরাকে বাঁ হাতে এঁটে ধরে দক্ষিণ হাতে লাগাম চেপে ধরলো।

তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। তারপর মনিরাকে নামিয়ে বলেন—এবার কিছুটা হাঁটতে হবে, পারবে?

পারবো।

কিন্তু আমি আর যাচ্ছিনে তোমার সঙ্গে ঐ যে গাড়িখানা পথের ওপরে দেখছো ওটা আমার গাড়ি। ড্রাইভার তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে!

মনিরা।

বল?

আবার কখন তোমার দেখা পাব?

যখন তোমার মন আমাকে ডাকবে, দেখবে ঠিক আমি তোমার পাশে পৌঁছে গেছি। আচ্ছা এবার যাও, আল্লাহ হাফেজ।

মনিরা এগুতে লাগলো, আর বারবার ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো বনহুর তাজের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মনিরা গাড়িখানায় পাশে পৌঁছতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। মনিরা আর একবার ঘুরে বনহুর আর তাজের দিকে ফিরে তাকিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলো।

গাড়ি বারান্দায় পৌঁছতেই মনিরা নেমে ছুটে গেল অন্দর বাড়িতে। দেখতে পেল তার সমস্ত বান্ধবী, যারা নৌকায় ছিল সবাই চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমকে গত রাতের ঘটনাটা বুঝাতে চেষ্টা করেছে। বৃদ্ধ

সরকার সাহেবের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। সকলের মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন।

চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমের চোখে অশ্রু, তাঁরা অবিরত কাঁদছেন।

মনিরাকে দেখতে পেয়েই বান্ধবীরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো। চৌধুরী সাহেব চোখের পানি মুছে এগিয়ে আসেন—কোথায় গিয়েছিলে মা, কি করে ফিরে এলি? ডাকাতরা নাকি তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

মেয়েরা একসঙ্গে বলে ওঠে—দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ নয়। তারই ঐ কাজ, কিন্তু কি করে ফিরে এলি ভাই?

চৌধুরী সাহেব বলেন—একটু সুস্থ হউক, সব শুনছি।

মনিরাকে পেয়ে মরিয়ম বেগম আনন্দে অধীর হলেন। তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—ভাল ছিলে তো, মা?

হ্যাঁ মামীমা। ভাগ্যিস এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকাতের নৌকা থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তাই রক্ষা। খুব ভদ্র মহৎ ব্যক্তি তিনি। খোদার অপরিসীম দয়ায় আর তাঁর কৃপায় এ যাত্রা পরিত্রাণ পেয়েছি।

সব শুনে আশ্বস্ত হলেন চৌধুরী সাহেব। বান্ধবীরা মনিরাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো। মরিয়ম বেগম বলেন—তোমরা বসো, আমি চা-নাস্তার আয়োজন করি।

চৌধুরী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন—কাল থেকে কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম, যাই পুলিশ অফিসে খবরটা জানিয়ে আসি। মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে হয়রান পেরেশান হচ্ছেন। তারপর সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন—চলুন, ওদিক হয়ে ডাক্তারখানায় যাব। আপনার আরও একটি ইনজেকশন লাগবে!

সরকার সাহেবও উঠে দাঁড়ান—চলুন।

সবাই বেরিয়ে যান। বান্ধবীরা একজন বলে—ভদ্রলোক কেমন দেখতে রে মনিরা?

হেসে বলে মনিরা —খুব সুন্দর। অপূর্ব!

অন্য একটি মেয়ে বলে—বয়স খুব বেশি?

না, খুব কম। তবে তিরিশের কাছাকাছি।

আর একজন বান্ধবী টিপ্‌পনি কাটে—খুব বড়লোক বুঝি?

মনিরা স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেয় রাজাধিরাজ?

প্রথম বান্ধবী চাপাকণ্ঠে বলে— সে কি বিবাহিত?

না।

একসঙ্গে সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে—মারহাবা! আমাদের নৌকাভ্রমণ সার্থক হয়েছে তাহলে!

একজন বলেন—মনিরার ভাগ্য বলতে হবে।

অন্যজন বলে—শুধু ভাগ্য নয়—সৌভাগ্য।

আর একজন বলে— ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন।

হ্যাঁ, পারে।

আমাদের হিংসে হচ্ছে কিন্তু।

আচ্ছা তোমাদের ভাগ দেব কিছুটা করে।

তখন আর দেখাবিনে, লুকিয়ে রাখবি সবার কাছ থেকে।

না, তোদের দেখাব কথা দিলাম।

এমন সময় মরিয়ম বেগম চা-নাস্তা ট্রে-সহ কক্ষে প্রবেশ করেন।

মনিরা উঠে গিয়ে মামীমার হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে নিজেই তৈরি করতে বসে।

❑

সে দিন বনহুর মাধুরীর ঘরে রাত কাটিয়ে গেছে কথাটা যখন সবাই জানতে পারলো তখন মাধুরীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভোরে যখন অদ্ভুতভাবে জামাইবাবু স্বয়ং এসে উপস্থিত হল তখন তো আরও ঘোরতর ব্যাপার। জামাই বাবু রাতের ঘটনা সব বর্ণনা করে শুনাল কিন্তু নিজের স্ত্রীর কক্ষে দস্যু বনহুর রাত্রিবাস করছিল এ যে যার-পর-নাই কেলেঙ্কারি কথা! অমন স্ত্রীকে জামাই নিমাই বাবু গ্রহণ করতে অসম্মত হলো।

মাধুরী অনেক করে বলেন—স্বামীর পা ছুঁয়ে শপথ করলো, দস্যু হলেও সে অতি মহৎ জন মাধুরীকে সে স্পর্শ করেনি। কিন্তু মাধুরীর কথাটা জামাই নিমাই বাবু বিশ্বাস করলো না।

শ্বশুর শাশুড়ীর কান্নাকাটি, স্ত্রী মাধুরীর চোখের জল নিমাইকে ধরে রাখতে পারলো না। সে রাগ করে চলে গেল।

মাধুরীর জীবনে নেমে এলো এক চরম পরিণতি। চোখের পানি হলো তার সম্বল। একি হলো তার বিয়ের পর স্বামীকে না চিনতেই তাকে হারাল মাধুরী। যত রাগ গিয়ে ছিল দস্যু বনহুরের ওপর, কিন্তু তার তো কোন অপরাধ নেই, দুস্য হলেও মাধুরী তার হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছে সে অতি মহান-অতি মহৎ। স্বর্গের দেবতার চেয়েও সে পবিত্র!

মাধুরী নিজের অজ্ঞাতে বনহুরের স্মৃতিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে। তার সৌম্যসুন্দর মূর্তি হৃদয় আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে সে। শত চেষ্টাতেও মাধুরী ভুলতে পারছে না দস্যু বনহুরের কথা। মানুষ কত হৃদয়বান হলে তবেই তার স্বভাব এমন দেবসমতুল্যা হতে পারে, সদাসর্বদা তাই ভাবে মাধুরী। মনের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে তার স্মৃতিকে। ঐ একটি রাতের পরিচয় মাধুরীর জীবনে এনে দেয় বিরাট একটা পরিবর্তন। বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখখানা মাধুরী কিছুতেই ভুলতে পারলো না।

মাধুরী ছিল মনিরার সহপাঠিনী। এককালে মনিরার সঙ্গে একই কলেজে পড়তো। মাধুরী ছিল হিন্দু, মনিরা মুসলমান, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ছিল গভীর একটা যোগাযোগ। মনিরা মাধুরীকে খুব ভালবাসত। হঠাৎ মাধুরীর বাবা দূরে শহরের অপর প্রান্তে একটি বাড়ি করে সেখানে চলে যান। সে জন্য ছাড়াছাড়ি হয় উভয়ের মধ্যে।

সেদিন মনিরা শহরের ঐ দিকে কোন প্রয়োজনবশতঃ গিয়েছিল হঠাৎ তার মনে পড়ে মাধুরীর কথা, একবার দেখা করে গেলে মন্দ হয় না। মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেছে খবরটা মাধুরীর একটা চিঠিতেই জানতে পেরেছিল। বাড়ির ঠিকানাটাও মাধুরী পাঠিয়েছিল তাকে।

মাধুরীর বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশি বিলম্ব হয় না মনিরার! গাড়ি রেখে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে ডাকে—মাধুরী—মাধুরী!

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, মাধুরী ঘরে শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিল, শুনতে পেরে ছুটে আসে। জড়িয়ে ধরে উভয়ে উভয়কে। মনিরা মাধুরীর সাদাসিধে পোশাক দেখে হেসে বলে— কিরে মাধুরী বিয়ে করলি, কিন্তু এমন কেন?

মনিরার কথায় মাধুরীর মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন হয়ে ওঠে, কি যেন ভাবে। তারপর বলে—মনি, ঘরে চল্ সব বলছি।

মনিরাকে সঙ্গে করে নিয়ে বসায় মাধুরী।

মনিরা হেসে বলে—এরই মধ্যে যে একেবারে বুড়ী বনে গেছিস মাধু, ব্যাপার কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে মাধুরী—ভাই, বিয়ে হয়েছে সত্য, কিন্তু ও বিয়ে আমার বিয়ে নয়!

তার মানে?

মানে, স্বামী বলে কিছু জানি না।

হেঁয়ালি রেখে সোজা কথা বল।

তবে শুন্ আমার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে, যদি ধৈর্য ধরে শুনিস তবে বলি।

বল আমি শুনতে চাই। মনিরা ভালো হয়ে বসলো।

মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলে—হঠাৎ আমার বাবা মামীমার নিকট থেকে একদিন একটা চিঠি পেলেন। তাতে লিখেছেন, আপনার কন্যা মাধুরীর জন্য একটি সুপাত্র পেয়েছি, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আসতে পার, তবে বিয়ে হবে কারণ পাত্রের মা ছেলের বিয়ে দিয়েই চলে যাব তীর্থে।

এ দিকে ঠিক সে সময় আমার দিদিমার ভীষণ অসুখ। জানিস তো দিদিমাই ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন। দিদিমার অসুখের জন্য এ বিয়েতে কেউ মত দিল না, কিন্তু বাবার ইচ্ছা তিনি এখানেই আমাকে সঁপে দেব। এত ভালো ছেলে নাকি আর পাওয়া যাবে না। কাজেই বাবা শুধু আমাকে নিয়ে রামনগর চললেন।! মা কিংবা আমাদের বাড়ির কেউ যেতে পারলেন না। দিদিমার অবস্থা খারাপ কখন কি হয়।

তারপর সেখানে পৌছে দুদিন কেটে গেল বিয়ের আয়োজন করতে। বাবা আমাকে নিয়ে মাসীমার ওখানেই উঠেছিল। তিনদিন পর বিয়ে হলো, কিন্তু বাসর শয্যার পূর্বেই একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির-দিদিমার মৃতপ্রায় অবস্থা, যদি দেখার ইচ্ছে থাকে চলে এসো। বিয়ে তো হয়েই গেছে কাজেই বাবা চলে আসতে চাইলেন। আমিও কেঁদেকেটে আকুল হলাম দিদিমাকে একটিবার শেষ দেখা দেখবো।

স্বামী রাগ করলেন তবু আমি বাবার সঙ্গে চলে এলাম। তারপর দিদিমা চলে গেল, শ্রাদ্ধ হলো, বাবা অনেক করে আমার স্বামীকে লিখলেন, কিন্তু

তিনি এলেন না। রাগ তার পড়েনি। তারপর পনেরো দিন যেতে না যেতেই স্বামীর চিঠি পেলাম, আমি অমুক দিন রাতের ট্রেনে তোমাকে নিতে আসছি।

চিঠি পেয়ে বাবা মা এবং আমিও অত্যন্ত খুশি হলাম। যাক রাগ তাহলে পড়েছে।

যেদিন উনি আসবেন ঐদিন আমার আনন্দ আর ধরে না। আমাদের পুরোন ভৃত্যটিকে পাঠালাম স্টেশনে ওকে এগিয়ে আনতে।

আসলেন উনি, রাত তখন তিনটে হবে। বাবা-মা তাকে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রহণ করলেন।

তারপর স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম রাত্রি।

মনিরা অবাক হয়ে শুনছে, ভাবছে এ আবার বলার মত কি! তবু হেসে বলেন—খুব খুশি লাগছিল বুঝি তোর?

হ্যাঁ সে, দিনের আনন্দ আমি কোনদিন ভুলব না মনিরা। স্বামী ঘরে এল, সে আমি প্রথম তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম। বিয়ের দিন লজ্জায় তাকে এমন করে দেখতে পারিনি। আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমার স্বামী এত সুন্দর! ভুলে গেলাম লজ্জা শরম স্বামীকে সাদর-সম্ভাষণ জানালাম। কিন্তু কি আশ্চর্য সে তাতে এতটুকু সাড়া দিল না।

সেকি।

হ্যাঁ, শুধু নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো।

তারপর? সে জানালো আমি বড় অসুস্থ ঘুমাবো! আমি তার ঘুমে বাধা দিলাম না। কখন যে রাত ভোর হয়ে গেছে চেয়ে দেখি পাশে সে নেই। তারপর যখন তার আসল পরিচয় পেলাম জানতে পারলাম সে আমার স্বামী নয়।

স্তব্ধকণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা—কি বল, সে তোর স্বামী নয়!

না।

তারপর?

আর তার দেখা পাইনি। ভোর হলো, আমার স্বামী স্বয়ং এসে পৌছলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন অন্য এক পুরুষ আমার কক্ষে রাত কাটিয়ে গেছে, তখন তিনি আর কিছুতেই আমাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। আমি তার পা ছুয়ে শপথ করেছি, সে আমাকে স্পর্শ করে নি, তবু—

এসব কি বলছিস মাধু! সব আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।

হ্যাঁ, সব আশ্চর্য। আজ তোকে ছুঁয়েও আমি শপথ করলাম।

এবার বুঝেছি তোর স্বামী তোকে অবিশ্বাস করেছেন।

হ্যাঁ।

এ তার ভারী অন্যায়। জেনে যদি কোন ভুল হয়, তার কি ক্ষমা নেই? আচ্ছা আজ উঠি ভাই।

মাধুরী বলে ওঠে গল্প করতে করতে সময় কাটলো। চা, খাবি নে?

আজ নয়, আর একদিন আসব।

❑

ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করতে করতে বলে মুরাদ নাথুরাম, তোমার মত বীর পুরুষকে যে কাবু করতে পারে সে কে হতে পারে।

নাথুরাম মাথা চুলকায়—হুজুর, আমি তাকে কোনদিন না দেখলেও বুঝতে পেরেছি সে দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ নয়।

তোমাদের এতগুলো লোককে দস্যু বনহুর পরাজিত করে চলে গেল অথচ তোমরা কিছু করতে পারলে না?

আমরা এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। দস্যু বনহুর কখন যে আমাদের একজন মাঝিকে সরিয়ে তারই ছদ্মবেশে আমাদের নৌকায় উঠে পড়েছিল, আমরা কেউ এতটুকু টের পাইনি।

ওকেই তো বলে বাহাদুরের বাহাদুরি। এবার বল মেয়েটা কোথায় গেল? ডুবে মরেনি তো?

না হুজুর, দস্যু বনহুর তাকে মরতে দেয়নি। সে সুস্থ শরীরে মামা মামীর পাশে ফিরে এসেছে।

কথাটা কানে যেতেই মুরাদের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো। আনন্দসূচক শব্দ ওঠে মুরাদ—মনিরা বেঁচে আছে।

হ্যাঁ হুজুর, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেমন করে হউক তাকে আপনার হাতে পৌঁছে দেবই। নইলে আমার নাম নাথুরাম সিং নয়। কিন্তু হুজুর আরও কিছু—হাতে হাত কচলায় নাথুরাম।

মুরাদ গম্ভীর কণ্ঠে বলে—পাবে, আরও পাবে। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পনের হাজার যা চাও তাই দেব, তবু ওকে চাই।

আচ্ছা হুজুর।

আর একটি কথা, তোমরা জেনে রাখ নাথু, যতদিন দস্যু বনহুরকে তোমরা নিঃশেষ করতে না পেরেছো, ততদিন তোমাদের কোন বাহাদুরি নেই। তাছাড়া তোমরা নিশ্চিন্ত নও। আমিও নই। কারণ, আমি জানি দস্যু বনহুর ভালবাসে মনিরাকে এবং সে কারণেই ওকে হত্যা করতে হবে। যতদিন দস্যু বনহুর জীবিত থাকবে ততদিন আমি মনিরাকে একান্তভাবে পাব না।

ঠিক বলেছেন, বনহুরকে হত্যা না করতে পারলে আমাদের কিছুই করা সম্ভব নয়। হুজুর আজ আর বিলম্ব করতে পারি না। এক্ষুণি আমরা আস্তানায় রওনা দেব, অনুচরগণ সেখানে অপেক্ষা করছে।

নতুন কোন খবর পেয়েছ বুঝি?

হ্যাঁ হুজুর, মনসাপুরের জমিদার কন্যা সুভাষিণী আজ পালকী যোগে দোল পূর্ণিমায় মেলা হতে মনসাপুরে ফিরছে। মেয়েটি অতি সুন্দরী।

মুরাদের চোখ দুটো ক্ষুধিত শার্দুলের মত জ্বলে ওঠে—তাই নাকি।

হ্যাঁ হুজুর।

তাহলে তো আর একটি নতুন শিকারের সন্ধান পেয়েছ। সাবাস নাথুরাম! সত্যি তুমি কাজের লোক।

❑

পুলিশ অফিস।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন পেছনে হাত রেখে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়েছিল। অদূরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। সকলের মুখেই গভীর চিন্তার ছাপ।

দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার পর পুলিশ মহলে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার পুলিশ পরিবেষ্টিত এ হাঙ্গেরী কারাগার। এ কারাগার থেকে কোন দস্যু আজ পর্যন্ত পালাতে পারেনি। পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা, লৌহ ইস্পাতে গড়া এই হাঙ্গেরী কারাগার। ছোটখাটো চোর ডাকুর জন্য এ কারাগার নয়। যে ডাকাত বা দস্যু অত্যন্ত দুর্দান্ত তাদের জন্যই এ কারাগার। শেষ পর্যন্ত সে কারাগার থেকেও পালাল দস্যু বনহুর। পুলিশমহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সুপার পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। এতকাল তিনি বহু দস্যু দেখে এসেছেন, কিন্তু দস্যু বনহুরের মত দস্যু তিনি দেখেন নি। কারাগারের ভেন্টিলেটরের শিক বাঁকিয়ে পালানো কম কথা নয়— এ যে অদ্ভুত কাণ্ড।

পুলিশ মহল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছে। শহরে বন্দরে, পথেঘাটে সকলের মুখেই এক কথা দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার হতে পালিয়েছে।

ইন্‌সপেকটার হারুন বলে ওঠেন, দেখুন আপনারা এ দস্যু বনহুরকে যাই মনে করুন, সে ভদ্রঘরের সন্তান। মিঃ চৌধুরীর মত মহৎ ব্যক্তির সন্তান সে, কিন্তু পরিবেশ তাকে এতখানি জঘন্য করে তুলেছে।

পুলিশ অফিসার মিঃ হোসেন বলেন একথা সত্য, শুনেছি দস্যু বনহুর নাকি অপূর্ব সুন্দর দেখতে।

জবাব দেন মিঃ হারুন শুধু অপূর্ব সুন্দর নয় মিঃ হোসেন, অপূর্ব সুন্দর এমন চেহারার লোক এমন হতে পারে কল্পনার অতীত।

আর একজন অফিসার বলেন, দস্যু হবে দস্যুর মত ভয়ঙ্কর, কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে সুন্দর। আমি শুনেছি দস্যু বনহুরের ব্যবহারও নাকি অত্যন্ত ভদ্র।

সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ মিঃ কাওসার, তার ব্যবহার যদি দেখতেন কিছুতেই আপনি তাকে দস্যু বলে মেনে নিতে পারতেন না। কথাটা বলে আসন গ্রহণ করেন মিঃ হারুন। তারপর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন—হাজার সুন্দর হউক, হাজার ভদ্র হউক, তবু সে দস্যু—ডাকাত। আইনের চোখে সে অপরাধী।

শুধু অপরাধী নয়, সে পলাতক আসামী। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসান। তারপর বলেন—মিঃ রাও, কি করা যায় বলুন তো? সমস্ত শহরে-বন্দরে সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করেছি। যাকে সন্দেহ হবে তাকেই এরেস্ট করে হাজতে ভরবে।

শঙ্কর রাও হেসে বলেন—শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুরকে ধরতে গিয়ে কত যে ভদ্রলোক হাজতে বাস করবে, তার ঠিক নেই।

অগত্যা এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছি মিঃ রাও। আপনার মত অভিজ্ঞ ডিটেকটিভও দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সক্ষম হলো না। কিন্তু মিঃ রাও, আবার আপনাকে নতুন করে বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য অবতীর্ণ হতে হবে।

ইয়েস, আমি এ ব্যাপারে সব সময় প্রস্তুত আছি।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও। আপনাকে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

এমন সময় একজন পুলিশ সাব-ইন্‌সপেকটার একখানা টেলিগ্রাম এনে মিঃ হারুনের হাতে দেয়—স্যার টেলিগ্রাম।

মিঃ হারুন টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে পড়ে দেখলেন। তারপর বলেন—আগামীকাল কমিশনার সাহেব স্বয়ং হাঙ্গেরী কারাগার দর্শনে আসছেন।

বলে ওঠেন মিঃ কাওসার, এবার তাহলে পুলিশ মহলকে নাচিয়ে ছাড়বে।

মিঃ নাসের বলে ওঠেন—দস্যু বনহুর শেষ পর্যন্ত কমিশনার সাহেবকেও ঘাবড়ে তুললো।

মিঃ খালেক এতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে শুনছিল। তিনি বলেন, হাঙ্গেরী কারাগার থেকে দস্যু পালানো সরকার বাহাদুরের চরম অপমানের কথা।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর সবাই বিভিন্ন কাজে উঠে পড়েন, সমস্ত থানায় এবং পুলিশ অফিসে ফোন করে কথাটা জানিয়ে দিল। কারণ সবারই প্রস্তুত থাকতে হবে, তিনি যেন তাদের দোষ-ত্রুটি ধরতে না পারেন।

❑

মনসাপুরের পথ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে। পাল্‌কী বেহারাগণ দ্রুত পা চালিয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠের হুম্ হুম্ শব্দে নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠেছে। আজকাল দিন সময় ভালো নয়, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি প্রায়ই লেগে আছে। পাল্‌কীটির সঙ্গে কয়েকজন বন্দুকধারী পাহারাদার চলেছে। পাল্‌কীটিতে রয়েছে মনসাপুরের জমিদার কন্যা, সঙ্গে একজন দাসীও আছে।

নির্জন পথ।

এতদ্রুত পা চালিয়েও পাল্‌কী বেহারাগণ সন্ধ্যার পূর্বে মনসাপুরে পৌঁছতে সক্ষম হলো না। পথিমধ্যেই নেমে এলো গভীর অন্ধকার। সুভাষিণী চিন্তিত কণ্ঠে বেহারাগণকে জিজ্ঞেস করলো—আর কত পথ আছে বেহারা?

একজন বেহারা বলে ওঠে—এখনও আরও দুক্রোশ যেতে হবে দিদিমণি?

তোমরা একটু জোরে পা চালাও। আমার কেমন ভয় লাগছে! একজন পাহারাদার বলে ওঠে—কুছ ভয় নেহি দিদিমণি। হাম লোক আপকো সাথ হায়।

আর কিছুক্ষণ চলার পর পথটা একটা বনের পাশ দিয়ে চলেছে, সে পথ দিয়ে এগিয়ে চলল তারা। কিন্তু বেশি দূর এগুতে সক্ষম হলো না। হঠাৎ একদল মুখোশপরা লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলো। মার মার কাট কাট শব্দে স্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠলো।

বেহারাগণ ভয়ে পাল্‌কী ছেড়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাল।

বন্দুকধারী পাহারাদারগণ প্রাণপণ চেষ্টায় দস্যুদলের সঙ্গে লড়তে লাগলো, কিন্তু চারজন পাহারাদার কতক্ষণ টিকতে পারে! দস্যুদল তিনজন পাহারাদারকে হত্যা করে ফেললো। একজন বন বাদাড় ভেঙে ছুটতে লাগলো মনসাপুর অভিমুখে।

এ দস্যুদল অন্য কেই নয়, শয়তান নাথুরামের দল। এবার নাথুরাম পাল্‌কীর পাশে এসে দাঁড়ালো। ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে সুভাষিণীর মুখমণ্ডল। বৃদ্ধা দাসী হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে।

নাথুরাম পা দিয়ে বৃদ্ধাকে সরিয়ে সুভাষিণীর হাত চেপে ধরলো। একটানে বের করে আনলো তাকে। মশালের আলোতে সুভাষিণীর দেহের অলঙ্কার ঝকমক করে উঠলো।

নাথুরাম বিকট শব্দে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ একেবারে স্বর্গজয়। একগাদা অলঙ্কারের সঙ্গে অপ্‌সরী লাভ! হাঃ হাঃ হাঃ নাথুরামের হাসির শব্দে রাতের অন্ধকার খান খান হয়ে ভেঙ্গে ছিল। একজন অনুচরকে লক্ষ্য করে বলেন সে—খাদু সিং একে কাঁধে উঠিয়ে নাও।

খাদু সিং তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে যেমনি সুভাষিণীকে ধরতে গেল, অমনি বৃদ্ধা দাসী সুভাষিণীকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো— না না, একে দেব না, একে নিতে দেব না।

বৃদ্ধাকে টেনে ফেলে দেয় খাদু সিং। কিন্তু বৃদ্ধা তাতে ক্ষান্ত হয় না, সুভাষিণীকে হারিয়ে মনিবের নিকটে কি জবাব দিবে সে, পুনরায় উঠে জড়িয়ে ধরে সুভাষিণীর দেহটা—কিছুতেই আমি সুভাষিণীকে নিতে দেব না....।

এবার নাথুরাম বৃদ্ধাকে জোরপূর্বক ছাড়িয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর বর্শার এক আঘাতে গেঁথে ফেলে ওকে।

বৃদ্ধার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে পুনরায় আদেশ করে—এবার ওকে ওঠাও।

কিন্তু সুভাষিণীও কম মেয়ে নয়। সে খাদুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করলো। কিছুতেই সে বশ্যতা স্বীকার করবে না।

হঠাৎ এমন সময় একটা খট খট্ শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। নাথুরাম উবু হয়ে মাটিতে কান লাগিয়ে শুনতে লাগলো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—খাদু, রংলাল, জগাই। তাড়াতাড়ি কর, মনে হচ্ছে কেউ ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছে। তাড়াতাড়ি যুবতীকে কাঁধে উঠিয়ে নাও।

সুভাষিণীকে এবার তিন-চার জন ধরলো। সুভাষিণী কিল-চড় লাথি দিয়ে বাধা দিতে লাগলো, কিন্তু সে নারী; কতক্ষণ নিজেকে রক্ষা করতে পারে। হাঁপিয়ে পড়েছে।

জগাই জোর করে এবার সুভাষিণীকে কাঁধে উঠিয়ে নিল।

ঠিক সে মুহূর্তে একটা কালো অশ্ব ছুটে আসছে বলে মনে হলো তাদের। ওরা কতক পালাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার পূর্বেই অশ্বারোহী এসে ছিল সেখানে। মাত্র কয়েক মিনিট, অশ্বটা দু'পা উঠিয়ে নিজেকে সংযত করে নিল। অশ্বারোহী ততক্ষণে অশ্ব থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। মাথায় কালো পাগড়ী মুখে কালো রুমাল বাঁধা। শরীরে কালো ড্রেস; এক একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে এক একজন শয়তানকে ধরশায়ী করে চললো সে।

জগাই তাড়াতাড়ি সুভাষিণীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে ছোরা বের করলো। খাদুও বর্শা উঁচিয়ে আক্রমণ করলো অশ্বারোহীকে।

অশ্বারোহী সকলকে বীরত্বের সঙ্গে পরাজিত করে চললো।

নাথুরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য লক্ষ্য করছিল, এবার সে অশ্বারোহীর বুক লক্ষ্য করে রিভলভার উচুঁ করে গুলি ছোড়ে। অশ্বারোহী মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়। নাথুরামের গুলি গিয়ে বিদ্ধ হয় অদূরস্থ বৃক্ষে। এবার অশ্বারোহী নাথুরামকে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ না দিয়ে আক্রমণ করে। অল্পক্ষণেই নাথুরামকে পরাজিত করে তার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেয় অশ্বারোহী।

নাথুরামকে পরাজিত হতে দেখে তার দলবল কে কোনদিকে পালালো ঠিক নেই। নিরস্ত্র নাথুরাম এবার উঠে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। অশ্বারোহী এগিয়ে এসে সুভাষিণীর সামনে দাঁড়ালো।

সুভাষিণী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছিল আর থর থর করে কাঁপছিল। না জানি এ আবার কোন্ দস্যু? অশ্বারোহী এগিয়ে আসতেই সুভাষিণী ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলেন—কে আপনি, আমাকে এভাবে রক্ষা করলেন।

অশ্বারোহী বলেন—আমি যেই হই, আপনার মঙ্গলাকাংখী। ঠিক সময় পৌছতে পেরেছিলাম বলে আপনাকে বাঁচাতে সক্ষম হলাম। আসুন এবার আপনাকে বাড়ি পৌছে দি।

সুভাষিণী। অন্ধকারে নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকালো অশ্বারোহীর মুখের দিকে। এ আবার কোন শয়তানি করবে না তো? বিশ্বাস কি? এই নির্জন স্তব্ধ বনভূমিতে সে একা যুবতী মেয়ে। অজ্ঞাত এক পুরুষের সঙ্গে কোথায় যাবে। তবু তার ড্রেস স্বাভাবিক নয়, মুখেই বা কালো রুমাল বাঁধা কেন, সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলো সুভাষিণী। এই বিপদ মুহূর্তে একমাত্র বৃদ্ধা দাসী তার সম্বল ছিল, তাকেও হত্যা করেছে শয়তান ডাকাতের দল। সুভাষিণীর চোখ দিয়ে জল পর্যন্ত বের হচ্ছে না, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে।

অশ্বারোহী হেসে বলল—ভয় পাবার কিছু নেই আমি মানুষ। তবু সুভাষিণী তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবছে, মানুষ সবাই, কিন্তু তাদের কত বিচিত্র রূপ।

অশ্বারোহী এবার বুঝতে পারলো সুভাষিণীর মনোভাব। সে তার সঙ্গে যেতে নারাজ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে তার মুখে।

নাথুরামের অনুচরগণের হাতে ছিল জ্বলন্ত মশাল। পালাবার সময় তারা হাতের মশালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। অশ্বারোহী উবু হয়ে একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় সুভাষিণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তারপর নিজের মুখের রুমালটা এক টানে খুলে মশালটা উঁচু করে ধরলো।

যুবক জানে তার চেহারায় এমন একটা আকর্ষণীয় বস্তু আছে যার কাছে সবাই নতি স্বীকার করতে বাধ্য।

মশালের উজ্জল্ আলোতে সুভাষিণী অশ্বারোহীকে দেখলো, কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিল না সে। একি কোন্ দেবকুমার। এত সুন্দর সুপুরুষ সে তো কোনদিন দেখেনি।

এবার বিশ্বাস হচ্ছে। হেসে বলেন অশ্বারোহী।

সুভাষিণী ধীরে শান্তকণ্ঠে বলেন—চলুন।

আসুন, ঘোড়ায় উঠতে হবে। অশ্বারোহী এগিয়ে চলে তার অশ্বের দিকে।

সুভাষিণী তাকে অনুসরণ করে।

অশ্বের পাশে এসে দাঁড়ালো উভয়ে। অশ্বারোহীর হস্তে তখনও জ্বলন্ত মশাল। সুভাষিণী নির্বাক আখি মেলে তখনও তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

অশ্বারোহী বলেন—আসুন, আপনাকে উঠিয়ে দি।

অশ্বারোহী সুভাষিণীকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও চড়ে বসে। সুভাষিণীর মনে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কে এই যুবক? কি এর পরিচয়? স্বর্গের দেবতা ছাড়া এত সুন্দর মানুষ হয়? সুভাষিণী মনে প্রাণে ওকে কৃতজ্ঞতা জানায়। যার শক্তির কাছে এতগুলো দস্যু পর্যন্ত পরাজিত হলো।

অন্ধকার ভেদ করে অশ্ব ছুটে চলেছে। অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী কালো পোশাকধারী আর সুভাষিণী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মনসাপুর জমিদার বাড়ি পৌছে গেল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখন পূর্ব আকাশে ভেসে উঠেছে।

জমিদার বাড়ির অদূরে একটা ঝোপের আড়ালে অশ্ব রেখে নেমে দাঁড়ালো অশ্বারোহী। তারপর সুভাষিণীকে অশ্ব থেকে নামিয়ে নিল সে। অশ্বারোহী বলেন—এবার আপনি বাড়ি যেতে পারবেন নিশ্চয়ই?

সুভাষিণী নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েছিল অশ্বারোহীর মুখের দিকে। চাদের আলোতে ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভুলে গেল সুভাষিণী জবাব দিতে।

অশ্বারোহী হেসে নিজের রুমালখানা বেঁধে নেয়। তারপরে বলে—ঐ আপনার বাড়ি দেখা যাচ্ছে , যান।

সুভাষিণী এবার জবাব দেয়—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ততক্ষণে অশ্বারোহী অশ্ব চড়ে বসেছে।

সুভাষিণী বলে ওঠে—একটি কথা, আপনার পরিচয়?

অশ্বারোহী প্যান্টের পকেট থেকে একটি কাগজের টুকরা বের করে সুভাষিণীর হাতে দিয়ে বলে—এতেই পাবেন আমার পরিচয়।

কিন্তু আবার কবে আপনার দেখা পাব?

ঈশ্বর না করুন আবার যদি এমন বিপদে পড়েন তখন... অশ্ব ছুটতে শুরু করেছে, শেষের কথার অংশগুলো আর শুনা যায় না!

অশ্বারোহী অদৃশ্য হতেই সুভাষিণী বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে। বাড়ির নিকটবর্তী হতেই দেখতে পায় তার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন মিলে জোট পাকিয়ে হুলস্থুল শুরু করছে।

মা কাঁদছেন, আরও অনেকে কাঁদছেন। কিছুসংখ্যক লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সুভাষিণী বুঝতে পারে, দস্যুকবল থেকে পালিয়ে এসে পাহারাদার তার পিতার নিকটে খবরটা জানিয়েছে, তাই এসব আয়োজন চলছে।

সুভাষিণীকে সুস্থ দেহে অক্ষত অবস্থায় অলঙ্কারপূর্ণ শরীরে ফিরে আসতে দেখে সবাই অবাক হলো। মা ছুটে এসে কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন। পিতা ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—মা, কি করে ফিরে এলি? কি করে ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেলি?

সুভাষিণী বলেন—সব বলছি, তোমরা ভিতরে এসো।

কন্যার সঙ্গে সবাই অন্দরবাড়িতে গিয়ে বসলো!

সুভাষিণী সব বলেন, কিন্তু কে যুবক এ এখনও জানে না। সকলের অজ্ঞাতে আলোর সামনে মেলে ধরলো কাগজের টুকরাখানা যার মধ্যে আছে তার অজ্ঞাতবন্ধুর পরিচয়। অতি সাবধানে খুলেন কাগজের টুকরাখানা। না জানি কোন রাজার ছেলে কিনা; কিংবা কোন দেবকুমার হবে সে কাগজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভয়ার্ত কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে সুভাষিণী—দস্যু বনহুর।

কতক্ষণ যে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো খেয়াল নেই ওর। যে দস্যু বনহুরের নামে গোটা দেশবাসীর আতঙ্কের সীমা নেই, যে দস্যুর নামে লোকের হৃদকম্প হয়, এ সে দস্যু বনহুর! সুভাষিণী একবার নয়, শত শত বার ঐ কাগজের টুকরাখানা ছিল।

❑

তাজের পদশব্দ চিনতো নূরী। ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছে, হঠাৎ অতি পরিচিত অশ্ব-পদশব্দ। নূরীর তন্দ্রা ছুটে গেল, দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াল, নূরী ছুটে এসে ওর হাত ধরলো—সত্যি হুর, আজ আমি তোমার জন্য খুব চিন্তিত ছিলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করতে পেরেছ?

বনহুর চলতে চলতে জবাব দেয়—খোদার অশেষ কৃপায় পেরেছি।

তাহলে রহমান তোমাকে একেবারে সঠিক খবরই দিয়েছিল, কি বল?

হ্যাঁ নূরী, খবরটা ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম বলেই মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারলাম। কিন্তু নূরী, ঐ শয়তান অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

হেসে বলে নূরী—তোমার কাছে শয়তানি কতক্ষণ টিকবে? দাও না যমালয়ে বিদায় করে।

হ্যাঁ নূরী, অচিরেই ওর সঙ্গে আমার একটা বুঝা-পড়া হবে। নাথুরামকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

নাথুরাম যে একজন দুর্দান্ত শয়তান জানে নূরী। মনে মনে শিউরে ওঠে সে। অজানা এক আশঙ্কায় দুলে ওঠে তার হৃদয়।

উভয়ে নীরবে এগুতে থাকে।

বনহুর বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে। নূরী ওর দেহ থেকে দস্যুর কালো ড্রেস খুলে নেয়। শয্যায় গিয়ে বসে বনহুর। হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের ললাটে। কপালের একপাশে কিছুটা অংশ কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আঁতকে ওঠে নূরী, একি হুর, তোমার ললাট কেটে গেছে। ইস... নূরী যত্নসহকারে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো।

বনহুর হেসে বলেন—ও এমন কিছু নয় নূরী। সেরে যাবে।

নূরী রাগত কণ্ঠে বলেন—তোমার ও কিছু নয়। ইস কতটা কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি ঔষধ এনে লাগিয়ে দেয় বনহুরের ললাটে তারপর অতি যত্নে বেধে দিতে থাকে কাপড় দিয়ে।

বনহুর নূরীর চিবুক ধরে উঁচু করে বলে—নূরী, আমার জন্য তোমার কত দরদ। কিন্তু আমি তো তোমার জন্য এতটুকু ভাববার সময় পাইনে!

এজন্য আমি দুঃখিত নই, হুর। আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস!

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে, এ বিশ্বাস যেন তোমার চিরদিন অটুট থাকে।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলের ফাকে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলে—হুর, মনে পড়ে সে ছোটবেলার কথা, তুমি আর আমি যখন এক সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতুম তুমি তীর ধনু দিয়ে পাখি শিকার করতে, আর আমি ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনতাম। তুমি খুশি হয়ে বলতে নূরী, কোনদিন তোকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না। মনে পড়ে সে কথা।

বনহুরের চোখের সামনে ছোটবেলার দৃশ্যগুলো ভেসে উঠে একের পর এক ছায়াছবির মত।

একদিনের দৃশ্য আজও বনহুরের মনে স্পষ্ট আঁকা আছে।

বনহুর আর নূরী ঝরনার পানিতে সাতার কাটছিল, হঠাৎ বেশি পানিতে পড়ে যায় নূরী। স্রোতের টানে বেসে যায় সে অনেকটা দূরে। বনহুর ভুলে যায় গোটা দুনিয়া, নূরী যে তার যথাসর্বস্ব নূরীকে হারালে তার চলবে না। নূরী ছাড়া বাঁচবে না বনহুর। নিজের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল বনহুর স্রোতের বুকে। অনেক কষ্টে নূরীকে সেদিন বাঁচাতে পেরেছিল সে। নূরীকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরে তার সেদিন কি আনন্দ! সব কথা আজ মনে পড়তে লাগলো বনহুরের।

বনহুর নূরীর হাতখানা তার নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বলে নূরী।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলাচ্ছিল, জবাব দেয়—বল। সত্যি তুমি কত সুন্দর!

হুর! অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে নূরী।

নূরী। আবেগভরা কণ্ঠ বনহুরের।

❑

সেদিন নৌকা ভ্রমণে মনিরার উপর হামলার কথাটা পুলিশ মহলে সাড়া জাগিয়েছিল, তাদের একমাত্র সন্দেহ এ কাজ দস্যু বনহুরের ছাড়া আর কারও নয়। কারণ বনহুর যে মনিরাকে ভালবাসে, এ কথা সবাই জেনে নিয়েছে। পুলিশ ইন্‌সপেকটার মিঃ হারুন এবং মিঃ রাও বসে এ বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলেন শঙ্কর রাও বলে উঠেন—ইন্‌সপেকটার, আপনার কি মনে হয় দস্যু বনহুরই মনিরার ওপর হামলা করেছিল?

হ্যাঁ, সে ছাড়া অন্য কেউ নয়। কারণ, মনিরাকে দস্যু বনহুর ভালবাসে, এ কথা একেবারে সত্য। পূর্বেও এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

শঙ্কর রাও বলে ওঠেন—তাহলে দস্যু বনহুরই তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ এবং সুস্থ অবস্থায় নিরাপদে তাকে পিতামাতার নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

পিতা-মাতা নয়, মামা-মামী।

সরি, হ্যাঁ মামা-মামীর পাশে ফিরে এসেছে মনিরা এবং দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কোন বদমাইশ তাকে এভাবে সসম্মানে ফেরত পাঠাত না নিশ্চয়ই। এতেই বুঝা যায় এ দস্যু বনহুরের কাজ।

এ সম্বন্ধে কি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেছিল?

করেছিলাম, কিন্তু সন্তোষজনক কিছু জানতে পারিনি।

রাও গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—ইন্‌সপেকটার, সত্যিই যদি দস্যু বনহুর মনিরাকে ভালবেসে থাকে তবে তাকে গ্রেফতারের একটা সুযোগ করে নিতে পারবো।

সেবার তাকে গ্রেফতারের সময় সো আমরা বিশেষভাবে জেনে নিয়েছি মিঃ রাও। আপনি সে পথ ধরেই এগুতে চেষ্টা করুন।

ঠিকই বলেছেন ইন্‌সপেকটার সাহেব, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে হলে ঐভাবেই এগুতে হবে এবং আমি আশা করি কৃতকার্য হবো।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও, আপনি এবার সফল হবেন বলে আমার মনে হচ্ছে।

শঙ্কর রাও এবার কিছুক্ষণ গালে হাত রেখে ভাবলেন। তারপর বলেন—ইন্‌সপেকটার, একটা প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে।

বলুন?

মনিরাও দস্যু বনহুরকে ভালবাসে, এ কথা আপনি জানেন?

আপনি কি বলতে চান দস্যু বনহুরের কোনই প্রয়োজন ছিল না মনিরাকে হানা দিয়ে চুরি করা, কারণ মনিরা স্বেচ্ছায় তার পাশে যেত।

সে কথা মিথ্যে নয়, ইন্‌সপেকটার সাহেব।

না, আপনি এবং আমি যা মনে করছি তা নাও হতে পারে। এক সময় হয়ত মনিরা তাকে ভালবাসতো, কিন্তু যখন তার আসল রূপ ধরা পড়েছে, যখন মনিরা জানতে পারল যাকে সে ভালবাসে সে স্বাভাবিক মানুষ নয়, সে দস্যু; তখন হয়তো তার মন ভেঙ্গে গিয়ে থাকতে পারে। ঘৃণা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

শঙ্কর রাও বলেন—তাহলে একটা কাজ করুন মিঃ হারুন, এতে আমার কিছুটা উপকার হবে; মানে কাজের সহায়তা হবে।

বলুন?

মিস মনিরাসহ তার মামা চৌধুরী সাহেবকে একবার এখানে আসতে বলুন। আমি তাদের মুখে এ ব্যাপারে কয়েকটা কথা শুনতে চাই।

বেশ, আমি এক্ষুণি ফোন করছি।

ধন্যবাদ।

মিঃ হারুন উঠে গিয়ে রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নিলেন—

হ্যালো?

ওপাশ থেকে ভেসে এলো চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠ—কে কথা বলছেন?

স্পিকিং মিঃ হারুন। হ্যাঁ, আমি পুলিশ অফিস থেকে বলছি। শুনুন মিঃ চৌধুরী, আপনি আপনার ভাগ্নী মিস মনিরাসহ দয়া করে যদি একটিবার আসেন! হ্যাঁ পুলিশ অফিসে...

চৌধুরী সাহেব বলেন—নিশ্চয়ই আমি আসছি ইন্সপেক্টর। আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি মা মনিরার কাছে জেনে নেই সে এখন আমার সঙ্গে আপনার ওখানে যেতে পারবে কিনা। কারণ, ওর এক বান্ধবীর ওখানে যাবার কথা আছে। রিসিভারের মুখে হাত রেখে ডাকেন চৌধুরী সাহেব—মনিরা, মা মনিরা, একটিবার এদিকে শুনো তো?

পাশের কক্ষ থেকে ভেসে আসে মনিরার কণ্ঠ—আসছি মামুজান।

অল্পক্ষণেই মনিরা এসে হাজির হয়—মামুজান আমায় ডাকছো?

হ্যাঁ মা, ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন বলছেন এক্ষুণি তোমাকে সঙ্গে করে যেতে। তাঁরা পুলিশ অফিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঠিক সে মুহূর্তে একটি দাঁড়িওয়ালা লোক কক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, চৌধুরী সাহেবের কথাগুলো কান পেতে শুনলো সে।

মনিরা মামুর কথায় জবাব দেয়—বেশ ভালই হলো, সেখান থেকে ফেরার পথে মাধুরীর বাড়ি হয়ে আসবো।

যাও মা, চট করে তৈরি হয়ে নাও তবে।

মনিরা বেরিয়ে যায়।

চৌধুরী সাহেব রিসিভারে মুখ রাখেন—হ্যালো, হ্যাঁ মনিরা যাবে। নিশ্চয় আসছি। থ্যাঙ্ক ইউ।

দাড়িওয়ালা লোকটি কক্ষে প্রবেশ না করে পিছু হটে বেরিয়ে গেল।

মনিরা চলে গেল নিজের কক্ষে।

অল্পক্ষণেই তৈরি হয়ে মনিরা মামুজানের পাশে এসে দাঁড়ায়। চৌধুরী সাহেব মনিরাকে লক্ষ্য করে বলেন—মা মনিরা, তোমার হয়ে গেছে দেখছি।

হ্যাঁ মামুজান, চলো।

গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব এবং মনিরা ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

চৌধুরী সাহেব আর মনিরা গাড়িতে উঠে বসে। ড্রাইভার ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই মিঃ হারুন নিজে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নামিয়ে নিলেন।

মিঃ হারুন হাত বাড়ালেন—হ্যালো চৌধুরী সাহেব, বিশেষ কয়েকটি কথার জন্য আপনাকে ডেকেছি। আসুন মিস্ মনিরা।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো, চৌধুরী সাহেব আর মনিরা নেমে অফিস রুমে প্রবেশ করলো।

অফিসরুমে প্রবেশ করতেই শঙ্কর রাও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ারে বসলেন তাঁরা।

মিঃ হারুন মনিরাকে জিজ্ঞেস করলেন—মিস মনিরা, আপনাকে একটু কষ্ট দেব। কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই?

বেশ করুন, এতে আমার কষ্ট কি! হেসে বলেন মনিরা।

মিঃ হারুন মনিরার দিকে একটু ঝুকে বসলেন, তারপর বলেন—মিস মনিরা, আপনাকে যে প্রশ্ন করা হবে আশা করি তার সঠিক জবাব পাব। আচ্ছা বলুন তো যেদিন আপনি আপনার বান্ধবীগণসহ নৌকা-ভ্রমণে যান, সেদিন মাঝিদের মধ্যে কোন সন্দেহজনক ভাব লক্ষ্য করেছিলেন কি?

না। কাউকে সন্দেহ হয় নি বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি।

হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যারা আপনার ওপর হামলা করেছিল তারা দস্যু বনহুরের দল?

মনিরা বলে ওঠে—এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, দস্যু বনহুর আমার ওপর হামলা করেনি।

শঙ্কর রাও বলে ওঠেন—আমি প্রথমেই অনুমান করেছিলাম, এ কাজ দস্যু বনহুরের নয়। নিশ্চয়ই এ অন্য একটি দল।

মিঃ হারুন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করেন, তারপর বলেন—আচ্ছা মিস মনিরা আপনাকে যে মাঝি দস্যুদল থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন কি?

না, তাকে আমি কোনদিন দেখিনি। কিন্তু সে ব্যক্তি অত্যন্ত মহৎ এবং তার দয়াতেই আমি দস্যুর হাত থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয়েছি। মনিরা বনহুরের নাম গোপন করে বলল।

মিস মনিরা, সে লোকটি যদি সত্যই মহৎজন হবে, তাহলে সে কখনও দস্যুদলে যোগ দিত না।

চৌধুরী সাহেব বলেন—অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অভাবের তাড়নায় মানুষ অনেক জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়।

হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়। বলেন মিঃ রাও।

আরও কিছুক্ষণ মনিরাকে নানা প্রশ্ন করেও সন্তোষজনক কিছু জানতে পারেন না তাঁরা।

মিঃ হারুন এবার চৌধুরী সাহেবকে বলেন—চৌধুরী সাহেব, আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, দস্যু বনহুর আপনার পুত্র জেনেও আমরা তাকে রেহাই দিতে পারছিনে।

চৌধুরী সাহেবের মনে যত ব্যথাই থাক গোপনে চেপে বলেন তিনি—সে দোষী, কাজেই আইনের চোখে সে অপরাধী। আমার পুত্র হলেও সে ক্ষমার পাত্র নয়।

থ্যাঙ্ক ইউ চৌধুরী সাহেব, এটাই হচ্ছে সত্য কথা। অপরাধী যতই স্নেহের পাত্র হউক, তাকে ক্ষমা করা চলে না। বলেন শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন বলেন—হ্যাঁ, এবার আসল কথা বলি চৌধুরী সাহেব।

বলুন?

দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার হতে পালিয়েছে এ কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

হ্যাঁ জানি।

যদিও আপনি তার পিতা, তবু আপনার কর্তব্য তাকে ধরিয়ে দেওয়া।

একটা ঢোক গিলে বলেন চৌধুরী সাহেব—হ্যাঁ।

এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য পাব।

চৌধুরী সাহেব একটু থেমে বলেন—হ্যাঁ পাবেন।

এমন সময় ড্রাইভার একখানা কাগজ এনে মনিরার হাতে দেয়—আপামণি আপনার যে কোন বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা ছিল সে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছে।

মনিরা কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাজ খুলে মেলে ধরলো চোখের সামনে। মুহূর্তে মনিরার চোখ দুটো উজ্জল দীপ্ত হয়ে ওঠে। কাগজে লেখা আছে "মনিরা, আমি তোমার জন্য লেকের ধারে অপেক্ষা করছি"—বনহুর।

মনিরা কাগজখানা ভাজ করে বলে ওঠে—মামুজান, আমার বান্ধবী এক্ষুণি আমাকে যেতে বলেছে, না গেলেই নয়। উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

চৌধুরী সাহেবও বলে ওঠেন—আমিও তাহলে চলি ইন্‌সপেক্‌টার সাহেব।

মিঃ হারুন বলেন—আপনার সঙ্গে আরও কিছু আলাপ আছে চৌধুরী সাহেব। মিস মনিরা, আপনি যেতে পারেন। আপনার মামুজানকে আমাদের অফিসের গাড়ি পৌঁছে দেবে।

চৌধুরী সাহেব ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলেন—ড্রাইভার, মনিরাকে সাবধানে নিয়ে যেও এবং হুশিয়ার থেক।

ড্রাইভার দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

মনিরা প্রফুল্ল চিত্তে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

মনিরা উঠে বসে বলে—লেকের ধারে চল।

বহুৎ আচ্ছা আপামণি। কথাটা বলে গাড়িতে স্টার্ট দেয় ড্রাইভার। গাড়ি উল্‌কাবেগে ছুটতে শুরু করে।

একি! গাড়ি যে লেকের পথে না গিয়ে অন্য পথে মোড় ফিরল। মনিরা শিউরে উঠলো, তীব্রকণ্ঠে বলেন—ড্রাইভার, কোথায় যাচ্ছ।

ড্রাইভার আসন থেকে বলে ওঠে—আপামণি, ও পথ বহুৎ খারাপ আছে। ইধার বাঁকা পথে যেতে হবে।

মনিরা চুপ করে রইলো, ড্রাইভার তাদের নতুন লোক নয়, তাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। কারণ সে জন্মাবধি এই শিখ ড্রাইভারকে দেখে আসছে। ওর কোলে কাঁধেই মানুষ হয়েছে মনিরা।

কিন্তু একি! লেকের ধারে না গিয়ে একেবারে নির্জন নদীতীরে এসে গাড়ি থেমে ছিল। ড্রাইভার আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো—আসুন আপামণি!

মনিরা রাগে গজ গজ করে বলে—ড্রাইভার, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে? এটাই বুঝি লেকের ধার?

হঠাৎ ড্রাইভার হেসে ওঠে— হাঃ হাঃ হাঃ মনিরা এখনও তুমি আমাকে চিনতে পারনি?

কে। কে তুমি?

নেমে এসো বলছি।

না, আমি কিছুতেই নামবো না। নিশ্চয়ই তুমি সে শয়তান, নৌকায় তুমি আমাকে চুরি করে...

হ্যাঁ আমিই সে, যাকে তুমি—ড্রাইভার মনিরার হাত ধরে ফেলে।

মনিরা তীব্রকণ্ঠে বলে—যাকে আমি ঘৃণা করি। শয়তান! এখনও তুমি আমার পিছু লেগে রয়েছ?

হ্যাঁ, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। নেমে এসো। যদি তোমার মঙ্গল চাও তবে নেমে এসো।

নির্জন নদী তীর একটি প্রাণী ও নেই আশেপাশে। মনিরার প্রাণ কেঁপে ওঠে। বার বার কত বার বনহুর তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে, এবার আর তার রক্ষা নেই। তবু দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে বলে সে—শয়তান আমি গাড়ি থেকে নামবো না।

ড্রাইভার মনিরার হাত চেপে ধরে—তোমাকে নামতে হবে। বলেই মনিরার হাত ধরে টেনে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলে।

মনিরার চোখেমুখে অসহায়ের চাহনি। আজ আর তার রক্ষা নেই। কেন সে ঐ চিঠিখানা বিশ্বাস করলো? কেন সে ড্রাইভারকে বিশ্বাস করলো? কেন তার সঙ্গে একা এলো?

ড্রাইভারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো সে। কিন্তু ড্রাইভারের বলিষ্ঠ হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতখানা মুক্ত করে নিতে পারলো না।

ড্রাইভার মনিরাকে নিবিড়ভাবে টেনে নিল কাছে।

মনিরা সে মুহূর্তে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল ড্রাইভারের গালে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের গাল থেকে তার নকল দাড়ি আর গোঁফ খসে ছিল। মনিরা বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—মনির তুমি!

ড্রাইভারের ছদ্মবেশী দস্যু বনহুর হেসে বলেন—হ্যাঁ আমি। এই বুঝি তোমার সাবধানে চলাফেরা, না?

মনির, আমি ভাবতেও পারিনি শিখ ড্রাইভারের বেশে তুমি! সত্যি তোমার চিঠি পেয়ে আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু যেখানেই যাও, সাবধানে যেও! আমার নামে অন্য কোন দুষ্ট লোকও তো চিঠি লিখতে পারতো।

সত্যি আমি বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বুকটা এখনও টিপ টিপ করছে।

এখন?

সব ভয় আমার দূর হয়ে গেছে।

চলো নদীর ধারে গিয়ে বসি। বনহুর কথাটা বলে এগুতে থাকে। মনিরা চলে তার পাশে পাশে।

নদীর কিনারে গিয়ে বসে ওরা।

মনিরা বনহুরের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলে—আজ কতদিন আসনি কেন বল তো?

কত কাজ আমার।

মনির, এখনও তুমি মানুষ হলে না। পুলিশমহলে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে সাড়া পরে গেছে, তোমাকে জীবিত কি বা মৃত এনে দিতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

জানি মনিরা, সব জানি। কিন্তু আমি তো সব সময় সকলের সামনেই বিচরণ করে বেড়াচ্ছি, ওরা কেন আমাকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় না?

মনির, ও কথা বল না। খোদা তোমাকে রক্ষা করুন। মনির, হাঙ্গেরী কারাগার তোমাকে আটকে রাখতে পরেনি, আর কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবেও না।

মনিরা!

সত্যি তুমি কত বড়! কত সুন্দর কত মহৎ....

অবশ্য তোমার কাছে। আচ্ছা মনিরা, তোমার যে বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা ছিল?

হ্যাঁ, মাধুরীর ওখানে, কিন্তু যাব না।

মাধুরী!

হ্যাঁ, মাধুরী, আমার এক পুরানো বান্ধবী। বড় অসহায় বেচারী...

কেন, কি হয়েছে তার? প্রশ্ন করে বনহুর।

সে এক অদ্ভুত ঘটনা। থাক, তোমার শুনে কাজ নেই।

না মনিরা বলতে হবে, তোমার বান্ধবী যখন সে, তখন আমারও বান্ধবী নিশ্চয়ই।

তবে শুন।

বল।

মাধুরীর বিয়ে হয়েছে কিন্তু ওর স্বামীকে সে একদিনের জন্যও পায়নি।

তার মানে?

বলছি শুন—তারপর মাধুরীর মুখে শুনা গল্পটা মনিরা সম্পূর্ণ খুলে বলে বনহুরের নিকটে।

স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনে যায় বনহুর। মনের মধ্যে তখন তার প্রচণ্ড ঝড় বেয়ে চলেছে। মাধুরী, যার সঙ্গে তার একটি রাতের পরিচয়!

মনিরা বলে চলেছে—সত্যি মনি, মাধুরীর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে...

বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে মাধুরীর ব্যথাভরা করুণ মুখখানা।

বনহুরকে চিন্তিত দেখে বলে মনিরা—কি ভাবছো মনির হঠাৎ তোমার কি হলো বলতো?

বনহুর গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় জবাব দেয়—উঁ।

কি ভাবছো?

ভাবছি তোমার সে বান্ধবীর কথা।

হ্যাঁ, ওর জন্য সত্যি বড় দুঃখ হয়। জান মনির, মাধুরী বলেছে, যে লোকটি ওর স্বামীর পরিচয় দিয়ে ওর কক্ষে রাত যাপন করে গেছে সে নাকি দেবতার চেয়েও মহৎ!

তাই নাকি?

হ্যাঁ দেখতেও সে নাকি অপূর্ব, মাধুরী বলে—জীবনে সে ওকে ভুলতে পারবে না কোনদিন। যতক্ষণ সে তার কথা বলেছিল কেমন যেন অভিভূতের মত বলে চলেছিল—সে সত্যি। মাধুরী ওকে ভালবেসে ফেলেছে...

বনহুর বলে ওঠে—থাক মনিরা ও সব কথা, এবার চলো ফেরা যাক, কেমন?

কিন্তু আমার যে ফিরতে ইচ্ছে করছে না মনির!

হেসে বলে বনহুর—বসলে ক্ষতি ছিল না মনিরা কিন্তু তোমাদের মোটর গ্যারেজের মধ্যে তোমাদের শিখ ড্রাইভার বেচারা ধুঁকে মরছে। মনিরা গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে—ওমা তাই নাকি! হ্যাঁ তার হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখে এসেছি।

সর্বনাশ!

তা নাহলে এই দিনের আলোয় তোমাকে পেতাম কি করে?

মনিরা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এত বুদ্ধি তোমার! চলো তবে।

চলো।

বনহুর আর মনিরা গাড়ির দিকে এগোয়।

মাধুরীর স্বামী নিমাই বাবুর কক্ষ।

নিজের ঘরে শুয়ে একটা বই পড়ছিল সে, রাত একটা দেড়টা হবে। নিমাইয়ের মনে নানা দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে। চোখে ঘুম নেই, তাই একটা বই নিয়ে তাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল।

বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়াও বইছে। গোটা বিশ্ব অন্ধকার। আজ নিমাইয়ের মনে মাধুরীর কথাই জাগছিল। এমন দিনে স্ত্রীকে কাছে পেতে কার না মন চায়। কিন্তু নিমাই ওকে গ্রহণ করতে পারে না। একটা সন্দেহের দোলা তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বই রেখে আলোটা কমিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিমাই, জানালাটা বন্ধ করে শোবে, ঠিক সে মুহূর্তে জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছিল একটি কালো মূর্তি। হাতে তার উদ্যত রিভলভার নিমাই যেমনি চিৎকার করতে যাবে, অমনি কালো মূর্তি রিভলভার চেপে ধরলো ওর বুকে—খবরদার!

নিমাই ঢোক গিলে বলে—কে তুমি!

ছায়ামূর্তি চাপাকণ্ঠে গর্জে ওঠে—দস্যু বনহুর!

ভয়ার্তকণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করলো নিমাই—দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ।

তুমি —তুমিই আমার স্ত্রীর কক্ষে....

হ্যাঁ আমিই, কিন্তু নিমাই বাবু আপনার স্ত্রী মাধুরীর কি অপরাধ?

নিমাই ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে—তুমিই তো তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছ শয়তান!

বনহুর দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলো নিমাইয়ের গলা—শয়তান আমি নই তুমি, মিথ্যা সন্দেহে নিজের স্ত্রীকে যে ত্যাগ করতে পারে, সে শয়তানের বড় শয়তান!

নিমাই যন্ত্রণায় আর্তকণ্ঠে রলে ওঠে—উঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার গলা! নিমাইয়ের চোখ দুটো বেরিয়ে আসে। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

বনহুর বলে—আগে বল তোমার স্ত্রীকে আর অবিশ্বাস করবে না? গলা ছেড়ে দেয় বনহুর।

নিমাই গলায় হাতবুলিয়ে বলে—কেমন করে তাকে আমি বিশ্বাস করবো?

দস্যু বনহুর কোনদিন মিথ্যা বলে না। তোমার স্ত্রী অতি পবিত্র, নির্মল। তাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার।

নিমাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের রুমাল বাধা মুখের দিকে।

বনহুর নিজের মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলে।

নিমাই কল্পনাও করতে পারেনি দস্যু বনহুরের চেহারা এত সুন্দর হবে, মুহূর্তে ওর মন থেকে ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়। বনহুরের স্বর্গীয় দীপ্তিময় দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আর অবিশ্বাস করতে পারে না। তাকিয়ে থাকে নির্বাক নয়নে।

হেসে বলে বনহুর—আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে।

অস্ফুট কণ্ঠে বলেন নিমাই—হ্যাঁ।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে কালই তুমি মাধুরীর হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে ওকে নিয়ে এসো। যদি এর অন্যথা হয় তবে মনে রেখ—হাতের রিভলভারটা উদ্যত করে ধরে—এর একটা গুলি তোমাকে হজম করতে হবে।

ভয়ার্ত চোখে নিমাই একবার বনহুরের মুখে আর একবার তার হাতে রিভলভারটার দিকে তাকায়।

বনহুর তাকে ভাবার সময় না দিয়ে এক লাফে মুক্ত জানালা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

❑

সুভাষিণী সেদিনের পর থেকে কেমন যেন ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। তার মুখের হাসি কোথায় যে মিলিয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই। সখীরা তাকে এমন বিষণ্ন ভাবাপন্ন হয়ে পড়তে দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পিতামাতাও উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন, তাদের একমাত্র কন্যার হলো কি? বড় বড় ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, কিন্তু কোন ডাক্তারই রোগ খুঁজে পাচ্ছে না। সুভাষিণীর মুখে তবু হাসি নেই। ঠিকভাবে নাওয়া খাওয়া নেই। সখীদের নিয়ে হাসি গল্প নেই, সদা সর্বদা কি যেন ভাবে সে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়—কিছু হয় নি আমার।

একদিন সখীরা ধরে বসলো—সুভাষিণী, আজ তোকে বলতেই হবে, সে দিনের পর থেকে তোর কি হয়েছে? ডাক্তার বলেছে অসুখ নেই। নিজেও বলিস কিছু হয়নি, তবে তোর হলো কি?

সুভাষিণী কারো কাছেই বলতে পারে না তার মনের কথা। সে একজন দস্যুকে ভালবেসে ফেলেছে তবু সে স্বজাতি নয় মুসলমান কিন্তু তার পক্ষে ওকে ভুলাও অসম্ভব। কেন—কেন তার।

মনে ওর প্রতিচ্ছবি এমন করে গেঁথে গেছে? সে তো সভ্য সমাজের কোন লোক নয়। সে একজন দস্যু।

সুভাষিণীকে নীরব থাকতে দেখে সখীদের একজন বলে ওঠে—কি ভাবছিস সুভা?

ভাবছি তোরা আমার মাথাটা খাবি।

সত্যি তুই আমাদের প্রশ্নের জবাব দিবি না?

না।

বেশ, আজ থেকে আমরা তোকে বিরক্ত করব না। কিন্তু মনে রাখিস সুভা, তুই না বললেও আমরা বুঝতে পেরেছি, একটা কিছু তোর হয়েছে।

সেটুকুই জেনে রাখ তোরা, তাহলেই হলো।

একদিন সুভাষিণী বাগানে বসে ভাবছে এমন সময় তার বড় দাদার বৌ চন্দ্রা দেবী এসে বসলো তার পাশে।

সুভাষিণী ফিরে তাকিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলো কোন কথা বলেন না। পূর্বে যে বৌদিকে দেখে তার খুশির অন্ত থাকে না আজ আর সঙ্গে কথাই বলে না সুভাষিণী। চন্দ্রা ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেন, তারপর সুভাষিণীর একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে বলেন—সুভা, আজ তোকে একটা কথা আমাকে বলতে হবে। বল বলবি?

স্থিরকণ্ঠে বলে সুভাষিণী বলার মত হলে, নিশ্চয়ই বলবো।

আচ্ছা সুভা, তুই যে বলেছিলি কে যেন তোকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে বাড়ি পৌছে দিয়েছিল?

হ্যাঁ সে এক ভদ্রলোক।

সুভা, এবার আমি বুঝতে পেরেছি, সে দিন ঐ ভদ্রলোক তোকে বাঁচিয়ে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু তোর হৃদয় চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

যাও, ঠাট্টা করো না বৌদি।

ঠাট্টা নয় সুভা, এতদিন ঘরে সদা সর্বদা তোর বিষয় নিয়ে ভেবে দেখেছি ঠিক, এই রকম কিছু একটা হয়েছে। দেখ সুভা আমি তোর বৌদি। লক্ষ্মী বোনটি আমার কাছে কোন কথা লুকোতে নেই।

জানি, কিন্তু বলে কোন লাভ হবে না বৌদি।

হবে, আমাকে বললে অনেক উপকার হবে তোর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সুভাষিণী—তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো এ কথা কার কাছে বলবে না, তবে বলতে পারি।

বল, বলবো না।

বৌদি, তুমি যা অনুমান করেছো। তাই সত্য। যে সেদিন আমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সে আমার গোটা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারছিনে বৌদি।

সুভাষিণী, এ কথা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তার কোন পরিচয় জানা নেই—কে সে? কি তার নাম? সুভা, অজ্ঞাত একজনকে হঠাৎ এভাবে ভালবেসে, তুই ভুল করেছিস।

বৌদি, তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কে সে?

বৌদি, তুমি শুনলে চমকে উঠবে, ভয়ে শিউরে উঠবে। আমাকে রক্ষাকারী সে লোকটি স্বাভাবিক লোক নয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, দস্যু বনহুর।

বিস্ময়ভরা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে। চন্দ্রা—দস্যু বনহুর!

বৌদি, প্রথমেই বলেছি, এ কথা তুমি কাউকে বলবে না।

সুভা, একি বলছিস তুই।

বৌদি, আমি গোটা অন্তর দিয়ে ওকে ভালবেসে ফেলেছি।

সুভা, একটা দস্যু , একটা কুৎসিত জঘন্য ব্যক্তিকে...

না, না, বৌদি, তুমি তাকে জানো না বৌদি, তুমি তাকে জান না। বৌদি! একটি বার যদি তুমি তাকে দেখতে। দস্যু বনহুর সে মানুষ নয়—দেবতা!

এসব কি বলছিস সুভাষিণী?

তোমাকে কি বলবো, বৌদি। আমি কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছিনে। সুভাষিণী চন্দ্রার হাত চেপে ধরে—বৌদি, বলো কি করবো আমি?

চন্দ্রার মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবে। তারপর বলে—সুভা, যাকে কোনদিন আর দেখার সুযোগ পর্যন্ত পাবি না, তাকে ভালবেসে নিজেকে বিসর্জন দিসনে।

সুভাষিণী চন্দ্রার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বৌদি! বৌদি।

চন্দ্র সস্নেহে সুভাষিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

❑

হাঙ্গেরী কারাগার পরিদর্শন করার পর পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ স্বয়ং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন অন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারসহ গোপনে মিঃ চৌধুরীর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছেন। সবাই আড়ালে থেকে লক্ষ্য করছেন। তাঁরা গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেয়েছেন, দস্যু বনহুর হঠাৎ কোন কোন দিন চৌধুরী বাড়িতে আগমন করে এবং মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

বেশ কয়েক রাত এভাবে তারা গোপনে পাহারা চালিয়ে চলেছে। ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছেন মিঃ আহমদ। দস্যু বনহুরের দেখা পাওয়াতে দূরের কথা, একটি প্রাণীও দেখতে পাননি তারা রাতের অন্ধকারে।

আজ অমাবস্যা। গোটা পৃথিবী অন্ধকার। এই রাতের প্রতীক্ষায় আছে মনিরা। প্রতি অমাবস্যা রাতেই বনহুর আসতো তার কাছে। আজও আসবে সে।

ওদিকে গুলিভরা রাইফেল আর রিভলভার নিয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিশ বাহিনী। মিঃ আহমদের চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। আর জ্বলছে তার হাতের রিভলভারটি।

গভীর রাত। মনিরা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। আজ আসবে মনিরা। বার বার ওর ছবিখানা নিয়ে দেখছে সে। ফুলের একটি মালা সুন্দর করে গেঁথে রেখেছে, এই মালাখানা পরিয়ে দিয়ে ওকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে মনিরা।

এমন সময় দূরে শুনা যায় অশ্বপদশব্দ।

মনিরার হৃদয়ে দোলা লাগে। মালাটা হাতে তুলে নিয়ে প্রতীক্ষা করে সে। বুকের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি নাড়া দিয়ে চলেছে।

মিঃ আহমদের দলবলের কানেও গিয়ে পৌঁছলো এই অশ্বপদ শব্দ। প্রত্যেকেই রিভলভার আর রাইফেল উদ্যত করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অশ্বপদশব্দ ক্রমে স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে।

ওদিকে মনিরার হাতে ফুলের মালা—

আর এদিকে পুলিশ বাহিনীর হাতে উদ্যত রিভলভার...

হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে তাজের পিঠে এগিয়ে আসছে দস্যু বনহুর।